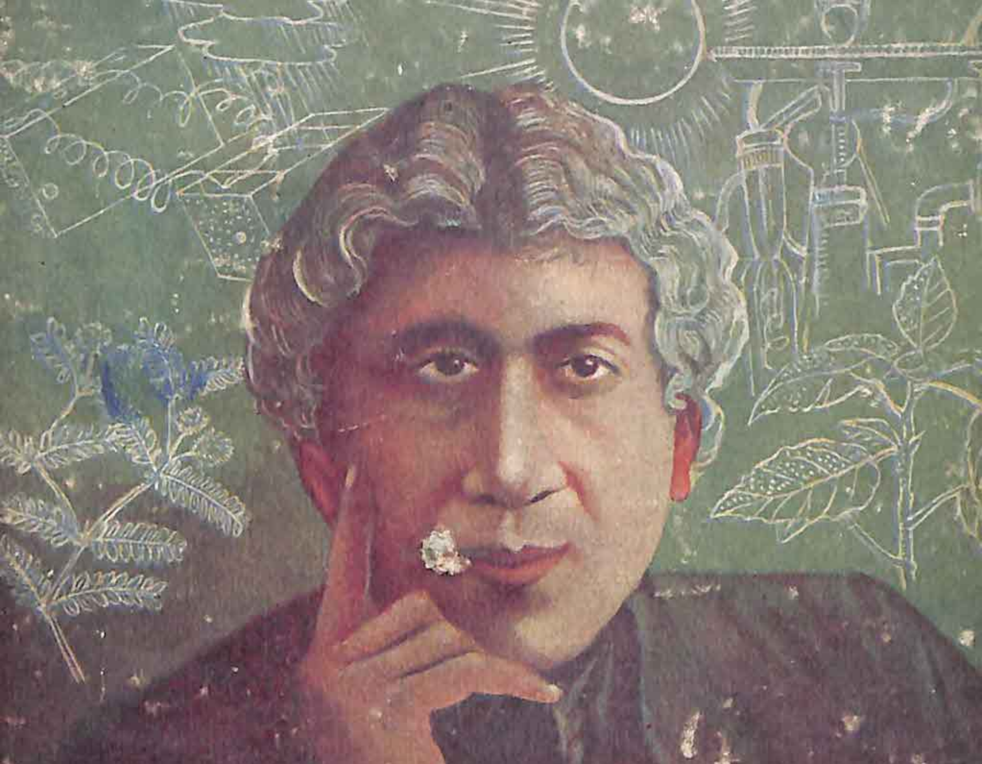


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

অমর-প্রতিভা-সিরিজ



আচার্য জগদীশচন্দ্র

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

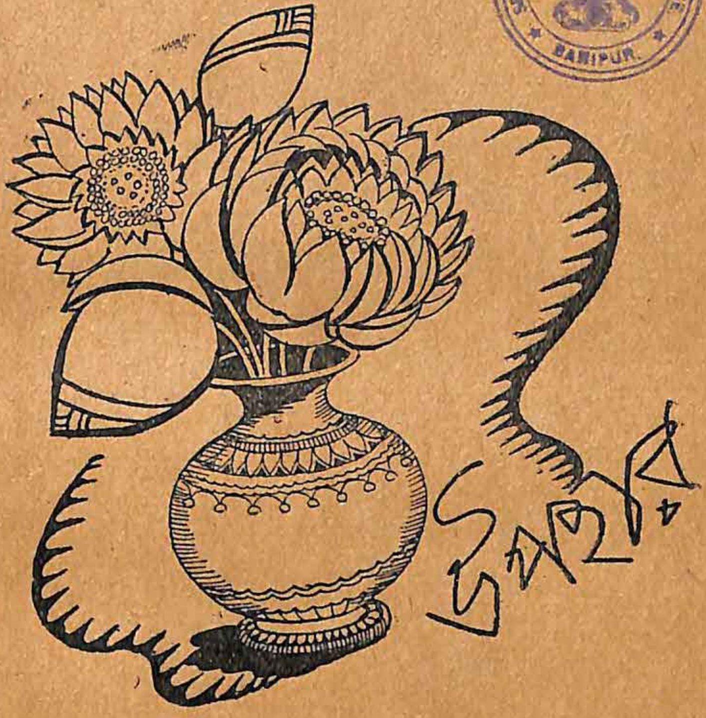
প্রকাশক
শ্রীসুবোধচন্দ্র সুর
(সুর এণ্ড কোং)

শরৎ-সাহিত্য-ভবন
২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ,
কলিকাতা ৪

প্রথম মুদ্রণ—১৩৫৬

বারো আনা

মুদ্রাকর—শ্রীশরৎচন্দ্র গাঁতাইত
ক্রাউন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, চৌধুরী লেন, কলিকাতা ৪



অমর-প্রতিভা-সিরিজ

রূপায়িত করেছেন, চিত্রশিল্পী—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পরিচালনা—

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

(কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠাতা)

শরৎ সাহিত্য ভবন



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

(জীবনী ও আবিষ্কার)

এক

বঙ্গভূমি রত্নপ্রসূ। অধঃপতনের যুগেও বিরাট প্রতিভাধর মহামানবগণের আবির্ভাব এ দেশকে ধন্য করিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের পর দুই শতাব্দী এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই, ইহারই মধ্যে—রাজনৈতিক দুর্গতি ও পরাধীনতার গ্লানি সত্বেও—বঙ্গমাতার ক্রোড়ে যে-সব বিরাট পুরুষের অভ্যাগম হইয়াছে, তাঁহাদের তুলনা—সুসভ্য পাশ্চাত্য স্বাধীন দেশসমূহেও অল্পই দেখিতে পাই। সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর, ধর্ম-সমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ, ধর্মপ্রচারে বিবেকানন্দ, কাব্যে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, কথাসাহিত্যে বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্র, নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্র, বাগ্মিতায় সুরেন্দ্রনাথ, আত্মত্যাগে চিত্তরঞ্জন ও নির্ভীক স্বদেশ-প্রেমিকতায় সুভাষচন্দ্র—ইয়োরোপ আমেরিকায় যে-কোন দেশে ইহাদের ভিতর যে-কেহ জন্মগ্রহণ করিলে সে-দেশ তাঁহাকে মাথার মণি করিয়া রাখিত।



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় বাংলা তথা ভারত, পাশ্চাত্য-জগতের তুলনায় পশ্চাৎপদ, স্বভাবতঃই পশ্চাৎপদ, কারণ পাশ্চাত্য দেশ এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষাগুরু। কিন্তু পাশ্চাত্য-গুরুর নিকট অধীত বিদ্যায় গুরুর সমকক্ষতা লাভ করিয়া বাংলার সন্তান উচ্চতম বিজ্ঞানেও নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। উপরে যে-সব মহাপণ্ডিতের নাম করা হইয়াছে, তাঁহাদেরই সঙ্গে একযোগে নাম করা যাইতে পারে যে-দুইজন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের, তাঁহারা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র। ইহাদের ভিতর আচার্য্য জগদীশচন্দ্র আবার মৌলিক-আবিষ্কারে জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন, পূর্ব হইতে সর্বজন-স্বীকৃত বহু বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের ভ্রমপ্রদর্শন করিয়া নব-নব সত্য-প্রতিষ্ঠা দ্বারা জগতের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বাংলার এই মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর। ঢাকা জেলার এক সম্পন্ন পরিবারে জগদীশচন্দ্রের আবির্ভাব হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল, ভগবানচন্দ্র। তিনি সুশিক্ষিত, মার্জ্জিতরুচি, দৃঢ়চেতা ও সদ্বিবেচক ছিলেন। উচ্চ রাজকার্য্যে তিনি জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। অর্থের অভাব তাঁহার কোনদিন হয় নাই। সেইজন্য পুত্রকে মনোমত শিক্ষা দিবার সুযোগও তাঁহার ঘটিয়াছিল।

জগদীশচন্দ্র কলিকাতায় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বি, এ পাশ করেন ও উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলাত



যাত্রা করেন। সাধারনতঃ এ-দেশীয় মেধাবী ছাত্রগণ তখন বিলাত গমন করিতেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী লাভ করিবার জন্য যাঁহারা তাহাতে অসমর্থ হইতেন, তাঁহারা অগত্যা ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেন—হাইকোর্টে বাহির হইয়া রাসবিহারী বা চিত্তরঞ্জনের মত দুই হাতে পয়সা লুটিবার জন্য। কিন্তু ভগবানচন্দ্র সত্যই সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। প্রকৃত শিক্ষা কাহাকে বলে তাহা তিনি বুঝিতেন। তিনি পুত্রকে বুঝাইয়া দিলেন, জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার ভিতর গৌরব সামান্যই, অর্থোপার্জনে কৃতিত্বই মানবতার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক নয়। দেশ বৈজ্ঞানিক প্রগতির দিক দিয়া একান্তই অনগ্রসর, এ-অবস্থায় মেধাবী ও সঙ্গতিবান ছাত্রগণের কর্ত্তব্য—বিজ্ঞানচর্চায় আত্ম-নিয়োগ করা। উন্নতমনা পিতার এই মহৎ সদুপদেশ পুত্রকে যে পথের নির্দেশ প্রদান করিল—সেই পথের পথিক হইয়া পরিণামে জগদীশচন্দ্র 'আচার্য্য' পদবীর অধিকারী হইয়া দেশে বিদেশে সম্মানিত ত হইয়াছিলেনই, বৈজ্ঞানিক-শিক্ষার অভাবজনিত দৈন্যও স্বদেশ হইতে বহুল পরিমাণে দূরীভূত করিয়া, বিশ্বসুধীসমাজে তাহার জন্য গৌরবের আসন অর্জন করিয়াছিলেন তিনি।

বিলাতে পৌঁছিয়া কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্ট কলেজে যোগদান করিলেন জগদীশ। স্বভাবতঃই পদার্থ-বিদ্যার প্রতি তাঁহার প্রবল আকর্ষণ ছিল, তাহারই অধ্যয়নে তাঁহার সমগ্র



সময় ও মনোযোগ অর্পণ করিলেন। তখন বৈজ্ঞানিকপ্রবর লর্ড র‍্যালে, ক্রাইষ্ট কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সৌভাগ্য-বশতঃ জগদীশচন্দ্র তাঁহার স্নেহ আকর্ষণে সক্ষম হইলেন। তাঁহারই নির্দ্দেশে ও পরিচালনায় জগদীশচন্দ্র নানারূপ জটিল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ব্রতী হইলেন। কলেজের ক্যাভেণ্ডিস্ লেবরেটরী ছিল এই সব পরীক্ষার স্থান। তৎকালে উক্ত লেবরেটরীর মত সর্ব বিষয়ে সুসজ্জিত ও সুসম্পূর্ণ বিজ্ঞানাগার পৃথিবীতে অধিক ছিল না। এই বিজ্ঞানাগারের উৎকর্ষ, ও শিক্ষক র‍্যালে্ মহোদয়ের পাণ্ডিত্য জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার স্ফুরণে যে-সাহায্য করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

এই প্রতিভার সম্যক পরিচয় লোকে পাইল তিন বৎসর পরে। লণ্ডন ইউনিভার্সিটির বি-এস-সি ও কেমব্রিজ ইউনি-ভার্সিটির ট্রাইপস পরীক্ষায় জগদীশচন্দ্র একই সময়ে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। যে দুইটি পরীক্ষার প্রত্যেকটিই যে-কোন অতি-মেধাবী ছাত্রেরও ভীতির বস্তু, তাহাদের দুইটিতেই যুগপৎ সসম্মানে কৃতকার্য্য হওয়া যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক—তাহা দেশে ও বিদেশে সর্বত্রই লোকে একবাক্যে স্বীকার করিল।

চারি বৎসর প্রবাসে যাপনের পর এইবার জগদীশচন্দ্রের স্বদেশে প্রত্যাগমনের সময় আসিল। অধ্যয়ন সমাপ্ত—এইবার গবেষণা ও অধ্যাপনার পালা। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে



প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে তাঁহার আহ্বান আসিল। অধ্যাপকরূপে এইখানেই তিনি যোগদান করিলেন। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজেরও লেবরেটরীর অবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। যে সকল গবেষণার কল্পনা জগদীশচন্দ্রের মস্তিষ্কে বিদ্যমান, তাহা কার্য্যে পরিণত করার সুযোগ কোথায়? অপরিহার্য্য যন্ত্রসমূহেরও অসদ্ভাব। অগত্যা নিজের উদ্ভাবনী প্রতিভার উপরই জগদীশচন্দ্রকে নির্ভর করিতে হইল। তিনি প্রয়োজনীয় যন্ত্রের সর্বাঙ্গসুন্দর নমুনা গঠন করিয়া দেশীয় শিল্পীর দ্বারা নিজের তত্ত্বাবধানে অতি সূক্ষ্মতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রও নির্মাণ করাইয়া লইলেন। এইভাবে কলেজের বিজ্ঞানাগারের দৈন্য জগদীশের অক্লান্ত চেষ্টায় ও অসাধারণ প্রতিভায় ক্রমে ক্রমে দূর হইতে লাগিল।

এইরূপ নানা প্রতিকূল অবস্থার বাধা ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া বৈজ্ঞানিকপ্রবরের ঐকান্তিক সাধনা নীরবে কিন্তু অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। গবেষণার প্রথম ফল আত্মপ্রকাশ করিল ১৮৯৫ অব্দে। স্থান—এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহ। বিষয়—ঈথর তরঙ্গের Refraction বা গতি পরিবর্ত্তন্। এই গবেষণার সাফল্য সাধারণ্যে সপ্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে নিজস্ব যন্ত্র গঠন করিতে হইয়াছিল। ক্রমে দুই একটি করিয়া আরও গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি এসিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠ করিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

কোন-কোনটির পাণ্ডিত্য, মৌলিকত্ব ও সম্ভাব্য পরিণতি এমনিই অসাধারণ ছিল যে বিলাতী সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকা-সকল তাহা সাগ্রহে মুদ্রিত করিতে লাগিল।

অবশেষে ঐ ১৮৯৫ সালেই বৈদ্যুতিক রশ্মি সম্বন্ধে তিনি রয়েল সোসাইটির সম্মুখে এক চমকপ্রদ, নানা তথ্য ও তত্ত্ব-বহুল বিবরণী পাঠ করিলেন। উহা রয়াল সোসাইটির নিজস্ব পত্রিকায় সসম্মানে প্রকাশিত হইল। এ সম্মান তখনকার দিনে কম বৈজ্ঞানিকের ও ততোধিক কম প্রবন্ধের অদৃষ্টে ঘটিত। ইহাতে প্রকারান্তরে রয়েল সোসাইটি তাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবীরগণের অন্যতম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। কেবল তাহাই নহে। রয়েল সোসাইটি তাঁহার গবেষণার সৌকর্য্যের জন্য একটি নিয়মিত বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। তদ্দর্শনে ভারত গবর্ণমেণ্টও জগদীশচন্দ্রের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, যাহাতে অর্থাভাবে বিশ্বকল্যাণকর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথে ব্যাঘাত না জন্মিতে পারে। রয়েল সোসাইটি জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা স্বীকার করিয়া লওয়ায় সমগ্র ইউরোপে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সকলে যেন চমকিয়া উঠিয়া সবিস্ময়ে এই সমুদ্রপারের বৈজ্ঞানিকের পানে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিতে লাগিলেন। সকলেই অনুভব করিলেন যে, বিজ্ঞানের জগতে নব-আবিষ্কারক একজন বহু দিন পরে দেখা দিয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় গুণীর মর্য্যাদা দানে চিরদিন অগ্রণী—তাঁহারা

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র



জগদীশচন্দ্রের মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কারের সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহাকে ডি-এস-সি উপাধিতে অলঙ্কৃত করিলেন। বিলাতের জয়পত্র যাঁহার ভাগ্যে জুটে, ভারত গবর্ণমেণ্টের উদারতার পরিচয়ও তিনি অচিরে লাভ করেন—ইহা বার বার প্রমাণিত হইয়াছে। লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ডক্টর উপাধি লাভ করিবার পরেই জগদীশচন্দ্রও ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রসন্ন দৃষ্টির অধিকারী হইলেন। সরকারী খরচে ১৮৯৬ সালে তাঁহার ইংলণ্ড গমন ও তথায় নব নব আবিষ্কারের সৌকর্য্য সাধনের ব্যবস্থা হইল।

ইংলণ্ডে পৌছিয়াই তাঁহার প্রথম কীর্ত্তি হইল—লিভারপুল বৃটিশ এসোসিয়েসনে তাঁহার স্বকীয় উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক বৈদ্যুতিক রশ্মি সম্পর্কিত যন্ত্রাবলীর প্রদর্শনী ও পরীক্ষা। এইগুলির সাহায্যে যে সব পরীক্ষা তিনি সাফল্যের সহিত সুধীজন সমক্ষে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের বহু-ঘোষিত যন্ত্র-সম্ভারের সাহায্যেও কোনদিন করিতে পারেন নাই। অতঃপর রয়েল সোসাইটিতে আরও দুইটি প্রবন্ধ বৈদ্যুতিক রশ্মি সম্বন্ধেই তিনি পাঠ করেন ও তাহা শ্রবণ করিয়া বৈজ্ঞানিকমহল রীতিমত চমৎকৃত হন।

এইবার তিনি ইউরোপ মহাদেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ পরিদর্শনে যাত্রা করিলেন। যেখানে যেখানে সুসজ্জিত, আধুনিক উন্নত প্রথায় পরিচালিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার আছে—সেখানেই তিনি গমন করিলেন। এই উপলক্ষে বিভিন্ন



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিল ও নিজের আবিষ্কার সম্বন্ধে নব নব তথ্য তাঁহাদের নিকট নিজ মুখে বর্ণনা করিবার সুযোগও তিনি লাভ করিলেন। প্রভূত সমাদর তিনি পাইয়াছিলেন সর্বস্থানের পণ্ডিতগণের নিকট, কিন্তু আন্তরিকতা পাইয়াছিলেন—একথা বলা চলে না। অনেক স্থানেই তাঁহাকে ঈর্ষা ও হিংসার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরাও কেহ-কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন—যাহাতে জগদীশচন্দ্র ভগ্নোৎসাহ, নিরুদ্যম হইয়া পড়েন ও তাঁহার আবিষ্কারগুলি জনসাধারণে প্রচারিত হইবার সুযোগ না পায়।

ইহার পরেই জগদীশচন্দ্র ১৮৯৭ সালে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং কলেজের অধ্যাপনার সাথেই মৌলিক সত্যের সন্ধান চালাইতে থাকেন। রয়েল সোসাইটিতে উপর্য্যুপরি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়া তিনি নিত্য নূতন কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন এই সময়ে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীতে সারা পৃথিবীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-বৃন্দের এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় যোগদানের জন্য আচার্য্য জগদীশচন্দ্রও সাদরে আমন্ত্রিত হন। ভারত-গবর্ণমেণ্ট অগত্যা তাঁহাকে স্বীয় ব্যয়ে ইউরোপে প্রেরণ করেন। প্যারী সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া আচার্য্যকে বহু বক্তৃতা দিতে ও বহু প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেকটিরই বিষয়-বস্তু ছিল তাঁহার নিজেরই কোন-না-কোন আবিষ্কার। এই



সব আবিষ্কার এমন সব চমকপ্রদ তথ্য পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক-সমাজের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিল যে, তাহা লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। ইহার পরে জগদীশচন্দ্র আবার ইংলণ্ডে গমন করেন ও প্রথমে ব্র্যাডফোর্ড ব্রিটিশ এসোসিয়েসন ও পরে লিলিয়ান সোসাইটির অধিবেশনে নানা তথ্য-সম্বলিত প্রবন্ধ পাঠ ও নানা গবেষণা-সঞ্জাত সাফল্যমণ্ডিত পরীক্ষাদি প্রদর্শন করিয়া ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দেন। দার্শনিকপ্রবর হারবার্ট স্পেন্সার তখন মৃত্যুশয্যায়, সে-অবস্থায়ও তাঁহার মনোযোগ এই সব নব আবিষ্কারের দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। সুস্থ হইয়া উঠিয়া তিনি এইগুলি সম্বন্ধে পরিপূর্ণ আলোচনা করিবেন—এই মর্মে তিনি জগদীশচন্দ্রকে পত্রও লিখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আর সুস্থ হইয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু জদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের পরিপূর্ণ তাৎপর্য্য ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতের আজিও আলোচনা গবেষণার অন্ত নাই।

অতঃপর জগদীশচন্দ্র আমেরিকায় গমন করেন। নবীন মহাদেশ পরম সমাদরে ভারতের এই বিজ্ঞানবিদ্‌কে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। কিন্তু হিংসা দ্বেষ সর্বত্রই আছে। নীচতারও একান্ত অসদ্ভাব নাই। কোন এক বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত একটি তথ্যের বিষয়, সাধারণে উহা প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই জানিতে পারিয়া, ঝটিতি উহা নিজের নামে বাজারে চালাইয়া



দিলেন। তাহা ছাড়া, মৌখিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিতে পঞ্চমুখ হইলেও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা কোনদিনই ভারতের এই কালা আদমির কৃতিত্ব প্রসন্ননয়নে দর্শন করেন নাই। আচার্য্যকে নিরুৎসাহ ও নিবৃত্ত করিবার জন্য, ভুল পথে পরিচালিত করিবার জন্য পরামর্শদাতা বন্ধুর অভাব কোনদিনই দেখা যায় নাই। তথাপি-যে জগদীশচন্দ্র এতাদৃশ প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন—তাহা শুধু এই কারণে যে, প্রকৃত প্রতিভা কখনও চাপা পড়িতে পারে না—আগুন কখনও ছাই-চাপা থাকে না।

রাজার কর্ত্তব্য দেশের সুধীগণের পোষকতা করা। জগদীশ-চন্দ্রের বেলায় ভারত গবর্ণমেণ্ট সে কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন—বলা চলে না। তবে একথা অনায়াসেই বলিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হইয়াছিল বিলম্বে, বিদেশে জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা স্বীকৃতি লাভ করিবার পরে। আরও একটি কথা বলিলে অন্যায় হইবে না। এ-হেন প্রতিভাধর মহাবৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার-প্রচেষ্টার সহায়তাকল্পে নানা যন্ত্র-সম্ভার আহরণের জন্য যেরূপ মুক্তহস্তে অর্থদান রাজসরকারের কর্ত্তব্য ছিল—তাহা ভারতগবর্ণমেণ্ট কোনদিনই করেন নাই। সর্ববিধ উন্নত যন্ত্রে সমৃদ্ধ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার এদেশে জগদীশচন্দ্রের প্রথম জীবনে ত ছিলই না, এখনও বোধ হয় নাই।

যে-সম্মান জগদীশচন্দ্র ভারত-সরকারের নিকট হইতে



পাইয়াছিলেন, তাহা প্রায়ই ছিল উপাধিগত। ১৯০৩ সালে C. I. E., ১৯১১ সালে C. S. I. ও ১৯১৭ সালে "সার" উপাধিতে গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে ভূষিত করেন। না করিলেও জগদীশচন্দ্রের ক্ষতি ছিল না। জগদীশচন্দ্রকে জগদীশচন্দ্র বলিলেই পৃথিবীর লোকে চিনে—গবর্ণমেন্ট-প্রদত্ত খেতাব তাঁহার পক্ষে বাহুল্য মাত্র। যে-বস্তু দিলে তাঁহার প্রকৃত সাহায্য হইত, সেই অর্থ যথেষ্ট পরিমাণে গবর্ণমেন্ট তাঁহার কর্ম-জীবনের সাফল্যকল্পে বিতরণ করিতে পারেন নাই। পারিলে হয়ত জগদীশচন্দ্র প্রকৃতি মাতার রহস্যাবৃত গুহামধ্য হইতে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোকিত জগতে টানিয়া আনিতে পারিতেন, জড়প্রকৃতিকে মানবসেবায় আরও ঘনিষ্ঠভাবে নিয়োগ করিবার উপায় নির্দেশ করিতে সক্ষম হইতেন।

গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত সমস্ত সম্মান অপেক্ষা বহুগুণে মূল্যবান মর্য্যাদা জগদীশচন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন রয়েল সোসাইটির নিকট হইতে। রয়েল সোসাইটির সদস্যপদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন তিনি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদেরাই শুধু এ পদ লাভ করিয়া থাকেন।

সরকারী কার্য্য ত্যাগ করিয়া জগদীশচন্দ্র ১৯১৬ সালে কলিকাতায় 'বসু গবেষণা মন্দির' নামে বিজ্ঞানশালার প্রতিষ্ঠা করেন। বহু দেশীয় যুবক এখানে জগদীশচন্দ্রের পরিচালনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

———



দুই

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সমূহের ভিতর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে—তাঁহার প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান ও চমকপ্রদ আবিষ্কার তাঁহাকে জগতের বৈজ্ঞানিক সভায় সর্বপ্রথম পরিচিত করিয়া দিলেও, তাঁহার কীর্ত্তিকিরীটের উজ্জ্বলতম মণিরত্নগুলি আহৃত হইয়াছে প্রাণী ও উদ্ভিদ গবেষণা হইতে—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

তাঁহার এই সব আবিষ্কারের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রথমে বুঝা দরকার—জীব ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে তৎ-পূর্ববর্ত্তী বৈজ্ঞানিক সমাজের ধারণা ও জ্ঞান কোন্ স্তরে পৌঁছিয়াছিল, এবং সেই ধারণা ও জ্ঞানের পরিপোষণ বা বিপর্য্যয় সংঘটনের জন্য নব আবিষ্কার কি কি এবং কোন্ দিকে জগদীশচন্দ্র কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে।

পূর্ববর্ত্তীগণ উদ্ভিদ-দেহের বহু জটিলতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রায়শঃই উদ্ভিদের প্রাণশক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ঐ প্রাণশক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ ও লীলা হইতে উদ্ভিদ-জীবনের রহস্যাবৃত ক্রিয়াকলাপ সমূহের তাৎপর্য্য সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা যে তাহা করেন নাই, এমনও বলা যায় না। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই যে প্রাণ-শক্তির দোহাই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করিতে সক্ষম হইয়াছে—তাহা নয়। একই কারণে উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অঙ্গে একই সময়ে

আচার্য জগদীশচন্দ্র



ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির আবেগ বা উত্তেজনা পরিস্ফুট হয় কেন—তাহা এই বৈজ্ঞানিকেরা বুঝাইতে পারেন নাই। না পারিয়া তাঁহারা দুই দলে দুই প্রকার কৈফিয়ত দিয়াছেন। প্রথম কৈফিয়ত হইল এই যে, জীব বা উদ্ভিদের দেহ একটা যন্ত্র-বিশেষ। যন্ত্রে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণে শক্তি সঞ্চারিত হইলে—যন্ত্র আপনিই নানাবিধ ক্রিয়ায় সজীব হইয়া উঠে। দ্বিতীয় কৈফিয়ত আরও চমৎকার। ইহার মর্ম এই যে, যে ঘোরতর অজ্ঞাত রহস্যে জীব ও প্রাণীদেহের জটিলতা আচ্ছন্ন রহিয়াছে, সে রহস্যের যবনিকা তুলিতে যাওয়া অনুচিত।

বলা বাহুল্য, এই উভয় মতবাদের ভিতরই কিয়ৎপরিমাণে সত্যের অস্তিত্ব রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা বাঁধা পথে না চলিয়া একটুখানি কল্পনা-শক্তির প্রয়োগ করিলে সমগ্র সত্যের স্বরূপ তাঁহাদের চোখে ধরা পড়িতেও পারিত। জগদীশচন্দ্র চিরপ্রচলিত মতবাদেরই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া কল্পনা-নেত্র উন্মীলন করিয়া উদ্ভিদ-জগতের গোপন রহস্য সমস্তই নিরীক্ষণ করিয়াছেন।

শক্তির উৎপত্তি যেখানেই হউক, তাহার কর্মক্ষেত্র কোথায়? শক্তির লীলা প্রকট হয় কোন্ স্থানে? নিশ্চয়ই জড়-জগতের আশ্রয়ে। 'জড়ের অবলম্বন না পাইলে শক্তি নিজের ক্রিয়া দেখাইবে কিসের উপরে? তাপ, বা আলোক—মূলতঃ শক্তির স্ফুরণ। কিন্তু জড় দেহের উপর ভিন্ন তাহাদের অস্তিত্ব প্রকট হইবে কোথায়? জড়দেহে তাপ বা আলোক বা বৈদ্যুতিক



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

শক্তি আসিয়া যখন আঘাত করে, তখনই জড় দেহের অণুগুলি বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, এবং বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলেই দর্শক বুঝিতে পারে যে, জড় দেহের উপর কোনও একটা শক্তি নিজের লীলা দেখাইয়া গিয়াছে। একটা হালকা লৌহ শলাকার কথা ধরা যাউক। শলাকার ভিতর অণুগুলি একটা নির্দিষ্ট নিয়মে সুসংবদ্ধ, সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। বাহির হইতে একটা চাপ তাহার উপর পড়িল। মনে করা যাউক—কেহ দুই হাতে তাহাকে বাঁকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। চেষ্টার পশ্চাতে যদি প্রচুর পরিমাণ শক্তি থাকে, তবে সে শক্তির ক্রিয়া শলাকার অণু সংস্থানের বিপর্য্যয় ঘটাইয়া ফেলিবে। অর্থাৎ অণুগুলি যে নিয়মে স্থাপিত থাকিয়া শলাকাটিকে সরল মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিল, সে নিয়ম উল্টাইয়া যাইবে। ফলে শলাকা আর সরল থাকিবে না—বাঁকিয়া যাইবে।

এক্ষেত্রে শক্তিটা বাহিরের শক্তি। এই শক্তি নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেছে শলাকার দেহে বিপর্য্যয় ঘটাইয়া।

এইরূপ উদ্ভিদের দেহের যদি পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে, বাহির হইতে তাপ, বা আলোক, বা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ আসিয়া তাহার দেহে আঘাত করিয়াছে। আঘাতের ফলে উদ্ভিদদেহে উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে। সমস্ত দেহে উত্তেজনা সমান ভাবে সঞ্চারিত হওয়া—হয়ত দেহের বিন্যাসের বিশেষত্ব নিবন্ধন সম্ভব হয় নাই, কোন স্থানে কম, কোন স্থানে বেশী পরিমাণে উত্তেজনা লক্ষিত হইয়াছে।



উত্তেজনার এই অসম প্রকোপ উদ্ভিদ দেহকে পূর্বের অবস্থায় আর থাকিতে দেয় নাই। কোন স্থানের অণুগুলি অত্যধিক প্রসারিত, কোন স্থানে বা অধিক পরিমাণে আকুঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতেই ঘটিয়াছে এই পরিবর্ত্তন। প্রাণশক্তির ইঙ্গিতে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—এ মীমাংসা এখানে অপ্রযোজ্য।

উদ্ভিদদেহের এই পরিবর্ত্তন সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে লজ্জাবতীলতার দেহে। আলোকের বা তাপের সংঘাতে তাহার পাতাগুলি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়—ইহা চাক্ষুষ দেখিতেই পাওয়া যায়। অন্য উদ্ভিদে সে বিকৃতি চাক্ষুষ দেখা যায় না। তবে কি ধরিয়া লইতে হইবে যে, শক্তির ক্রিয়া অন্য উদ্ভিদের উপর খাটে না? না, তাহা নয়। শক্তির ক্রিয়া সমস্ত উদ্ভিদের উপরই সমান ফলপ্রসূ হয়। অণুসংস্থানের বিকৃতি সকল উদ্ভিদের দেহেই সমান ভাবে সংঘটিত হইয়া থাকে। পার্থক্য এই যে—কোন কোন উদ্ভিদের দৈহিক গঠন এরূপ যে, এই বিকৃতি বাহ্যিক ভাবে প্রকাশ লাভ করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আম, কাঁঠাল বা ঐরূপ অন্য বৃহৎ বৃক্ষ সমূহের কথা বলা যাইতে পারে। জগদীশচন্দ্র কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত যন্ত্র দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লজ্জাবতীলতার দেহে তাপ বা আলোকের সংস্পর্শে যে বিক্ষোভ ও আকুঞ্চনের উৎপত্তি হয়, বৃহৎ মহীরুহের দেহেও তাহা ঘটিয়া থাকে, যদি আলোকের সংঘাত যথেষ্ট পরিমাণে প্রবল হয়। কিন্তু ঐ সব



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

বৃক্ষের দেহের অণু সংস্থান এরূপ যে—কোন বাহ্য বিক্ষোভ বৃক্ষের দেহে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হয় না।

উদ্ভিদের দেহের আণবিক সংস্থান বিপর্য্যস্ত হইলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নানারূপে। তাহার ভিতর সর্বপ্রধান হইতেছে এই যে, বিকৃত অংশ হইতে কোষনিহিত জলাংশ সবলে নিঃসারিত হইয়া অন্যদিকে ছুটিতে থাকে। জলাংশের সহিত বৈদ্যুতিক শক্তির প্রবাহও সেই অভিমুখে ধাবিত হয়। অবিকৃত অবস্থায় উদ্ভিদের দেহস্থিত অগণিত কোষসমূহ জলীয় পদার্থে পরিপূর্ণ থাকে। আঘাত পাইলেই অণু বিন্যাস বিপর্য্যস্ত হয় ও অণুর গঠন-প্রকৃতির ভিতর পরিবর্ত্তন আসে। কাজেই সেই রস-অংশ স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়ে ও দেহের অন্যান্য অবিকৃত অংশ-পানে ছুটিয়া চলে। যে স্থান হইতে জলীয় অংশ বাহির হইয়া গেল, সে অংশ কাজে-কাজেই সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারই ফলে উক্ত স্থানের ডালপাতা নামিয়া পড়ে। এই আনমন ক্রিয়া সব চেয়ে সুপরিস্ফুট হয় লজ্জাবতী-লতা ও তজ্জাতীয় অন্য কয়েকটি উদ্ভিদের দেহে।

তদ্ভিন্ন অন্যান্য উদ্ভিদের দেহে এই লক্ষণটি যে সম্যক পরিস্ফুট হয় না, তাহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের ভিতর অনুরূপ বিকৃতি সংসাধিত হয় নাই? কখনই তাহা নয়। আঘাত করিলেই যে-কোন উদ্ভিদের দেহে একই প্রকৃতির আণবিক বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। আহত অংশের অভ্যন্তরে অবস্থিত জলীয়

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র



কোষ হইতে জলপ্রবাহ নিঃসারিত হইবে ও বৈদ্যুতিকপ্রবাহ ধাবিত হইবে অনাহত প্রদেশে—ইহা অনিবার্য্য। জলীয় অংশ বাহির হইয়া যাইবার পর আহত স্থান সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে; তাহারই ফলে বাহিরে ডালপালা ও পত্র-পল্লবের আনমন ঘটিবে—ইহা কিন্তু সব ক্ষেত্রে সমান সুনিশ্চিত নহে। তাহার কারণ এই যে, কতকগুলি উদ্ভিদের দেহে এরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া সম্ভব, অন্যগুলির দেহে সম্ভব নয়। আম্রবৃক্ষের দেহ এভাবে গঠিত যে, ভিতরে জলীয় কোষ শূন্য হইয়া গেলেও তাহার ফলে তৎক্ষণাৎ গাছের বাহির দিকটা সঙ্কুচিত বা আনমিত হইয়া পড়িতে পারে না। লজ্জাবতী, ভুমি-আমলা প্রভৃতি উদ্ভিদে এই সঙ্কোচনাদি এত দ্রুত কি কারণে সংসাধিত হয়—তাহা এইবার আলোচনা করা যাউক। একটা প্রাণীকে আঘাত করিলে সে কাঁদিবে ও চীৎকার করিবে এবং হাত পা আছড়াইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু প্রাণীটি যদি মূক হয়, তবে সে চীৎকার করিতে পারিবে না। যদি চক্ষু না থাকে, তবে তাহার অশ্রু দেখা যাইবে না। এবং হাত-পা যদি দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, তবে সে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্ষেপ করিতে পারিবে না। তবে কি এই সব কারণে আমাদিগকে ধারণা করিয়া লইতে হইবে যে, মূক, জন্মান্ধ বা বদ্ধ-হস্তপদ প্রাণী যন্ত্রণাবোধে অক্ষম? কখনই না! যন্ত্রণার অনুভূতি তাহার সাধারণ প্রাণীর মতই প্রবল—কেবল যন্ত্রণার অভিব্যক্তির বেলায় তাহার কিছু ব্যতিক্রম



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

ঘটিতেছে। আম কাঁঠালের মত বৃহৎ বৃক্ষের বেলায়ও কতকটা সেই রকম ব্যাপারই ঘটে। কতকগুলি উদ্ভিদের পাতা, ডাল ও বোঁটা এমনই কৌশলে বিন্যস্ত যে, সঙ্কোচনাদি দ্বারা যন্ত্রণা প্রকাশে তাহারা সক্ষম। অন্য কতকগুলি উদ্ভিদের পত্রাদির বিন্যাস-কৌশল এরূপ বাহ্য প্রকাশের প্রতিকূল। কিন্তু প্রকাশ না থাকিলেও অনুভূতি পূর্ণ মাত্রায়ই বিদ্যমান—তাহা ধরা পড়ে, বৈদ্যুতিক প্রবাহের দ্বারা।

লজ্জাবতী জাতীয় উদ্ভিদের পাতা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে—পাতার বোঁটার মূলে একটি বিশেষ গ্রন্থি আছে, যাহার নাম ইংরেজিতে Pulvinus. ইহার ভিতর একটি যন্ত্র আছে—যাহা অনেকটা কব্জার মত কাজ করে। উদ্ভিদ দেহের অন্যান্য অংশের জলীয় কোষগুলির অপেক্ষা এই Pulvinus-এর ভিতরের কোষগুলির আকার বৃহত্তর, এবং তাপ বা তাপের অভাব ইহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে অধিকতর পরিমাণে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই সকল কোষ জলে পূর্ণ থাকে এবং পাতাগুলি মাটির উপর সমান্তরাল ভাবে প্রসারিত থাকে। আঘাত পাইলে পাতার গোড়ায় Pulvinus বা পত্রমূলটি চঞ্চল হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে-সঙ্গে পত্রমূলস্থ ঐ সকল কোষ হইতে প্রচুর পরিমাণে রস বাহির হইয়া যায় ও বৃক্ষের সকল অংশে সঞ্চারিত হইতে থাকে। ফলে পত্রমূলে ঘটে রসের অভাব ও তজ্জনিত সঙ্কোচন। পত্রমূল সঙ্কুচিত হইলে পাতাও নামিয়া পড়ে। কারণ, পাতার মূল ঐ



পত্রমূল হইতেই উৎপন্ন। এইরূপেই লজ্জাবতী জাতীয় উদ্ভিদের পাতায় বিকৃতি ঘটে। বলা বাহুল্য, এই বিকৃতি সাময়িক। যে আঘাতের ফলে বিকৃতি ঘটিয়াছিল, তাহা বন্ধ হইলে ধীরে-ধীরে পত্রমূলস্থ কোষগুলিতে আবার রসের সঞ্চার হইতে থাকে এবং ঐ রস পত্রগুলির সঙ্কুচিত অবস্থা দূর করিতে সচেষ্ট হয়। এই যে পত্রমূল বা Pulvinus, যাহা লজ্জাবতীর বিকৃতি সহজে দৃষ্টিগোচর করাইয়া দেয়, তাহা অধিকাংশ উদ্ভিদে বর্ত্তমান নাই—এবং সেই কারণেই সে-সকল উদ্ভিদের পাতার ভিতর আকুঞ্চন বা সঙ্কোচন চোখে ধরা পড়ে না। ঠিক এই বস্তুটিই জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত যন্ত্রাদির সাহায্যে অতি সুন্দর ও চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে, অণুর সংস্থান যদি জড়-পদার্থের দেহে ও জীবের দেহে একই প্রকার হয়, তবে বাহ্যিক শক্তির সংঘাতে সেই অণুর বিকৃতিও জড়ে ও জীবে একই প্রকারের হইবে। প্রাণীদেহ, উদ্ভিদদেহ, এমন কি—ধাতুদেহও একই উত্তেজনায় একই প্রকারে উত্তর দেয়।

একথা সকলেরই জানা আছে যে, সর্বনিম্ন স্তরের উদ্ভিদ হইতে আরম্ভ করিয়া যদি আমরা ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর স্তরে আরোহণ করিতে করিতে উদ্ভিদ-শ্রেণীবিভাগের সমস্ত পর্য্যায়গুলি একে একে পরীক্ষা করি, তবে এমন একটা স্থানে আসিয়া এক সময়ে আমাদিগকে উপস্থিত হইতে হইবে—যেখানে



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

দ্রষ্টব্য পদার্থটি উদ্ভিদ বা প্রাণী কোন্ পদবাচ্য হইবে, তাহা সহসা বুঝিয়া উঠা কঠিন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রও ঐ কথাই বলেন। সযত্ন পরীক্ষার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, জড়-পদার্থের শেষ ও উদ্ভিদের প্রারম্ভ কোথায়, এবং উদ্ভিদের শেষ এবং প্রাণীর প্রারম্ভ কোথায়, সে সীমারেখা নির্দেশ করা কোনক্রমেই সম্ভব বা নিরাপদ নহে। আমাদের সাধারণতঃ এই ধারণা যে, যে সজীব, তাহারই মৃত্যু ঘটে। আচার্য্য বলেন—মৃত্যু পদার্থ-মাত্রেরই হইতে পারে। উত্তেজনার সংঘাতে অণু বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই বিকৃতির অবসানে অণু আবার পূর্ব্বাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। কিন্তু বিকৃতি যদি এরূপ চরম হয় যে, পদার্থটি আর পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারিল না—তাহা হইলেই বলা হয় যে উহার মৃত্যু ঘটিল। এই মৃত্যু জড়, উদ্ভিদ ও জীব সকলেরই ঘটা সম্ভব। মৃত্যু ঘটিলেই যে ধরিয়া লইতে হইবে যে, বস্তুটি পূর্ব্বে সজীব ছিল—তাহা নয়।

উদ্ভিদ কিরূপে মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে ও বায়ু হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে, কিরূপে তাহার অবয়ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় ও পুষ্ট হয়—তাহাও একটা দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার। পূর্ব্বে ধারণা ছিল—উদ্ভিদের প্রাণশক্তিই তাহাকে বাঁচিয়া থাকা ও বাড়িয়া ওঠার উপায় দেখাইয়া দেয়। যে পদ্ধতিতে এই ধারণার পোষকতাকল্পে প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহা আচার্য্যদেবের আবিষ্কারের ফলে যুক্তিসহ নয় বলিয়াই



প্রতীয়মান হইয়াছে। তিনি বলেন এগুলি প্রাকৃতিক ব্যাপার—ইহার দ্বারা প্রাণশক্তি নামে কোন বিশেষ শক্তির অস্তিত্ব কোন ক্রমেই প্রমাণ হয় না। বাহির হইতে শক্তি আসিয়া উদ্ভিদদেহে অণুসংস্থানের বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে—তাহারই ফলে ঘটিতেছে নানা পরিবর্ত্তন, তাহারই শক্তির কিয়দংশ ভিন্নভাবে উদ্ভিদদেহে সক্রিয় হইয়া তাহার পুষ্টি ও বৃদ্ধির সাহায্য করিতেছে। সে শক্তি বাহিরেরই শক্তি, উদ্ভিদ-দেহের নিজস্ব প্রাণশক্তি বা অপর কোন শক্তি নয়।

তিন

প্রাণীদেহ ও উদ্ভিদদেহে যে গঠনমূলক ঐক্য প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান—ইহাও জগদীশচন্দ্রের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। প্রাণীদেহে এমন সব স্থান আছে যেখানে উত্তেজনার কারণ ঘটিলে সেই উত্তেজনা স্নায়ুর সাহায্যে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। উদ্ভিদের দেহেও এই প্রকার উত্তেজনার প্রবাহ চলাচলের লক্ষণ জগদীশচন্দ্র দেখিতে পাইয়াছেন। প্রাণীদেহে মাংসপেশী যেভাবে এই উত্তেজনাকে সঞ্চারিত হইবার সাহায্য করে, উদ্ভিদদেহেও সেইরূপ কোষের অস্তিত্ব রহিয়াছে—তাহারাই বাহির হইতে আগত উত্তেজনাকে সমগ্র দেহে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া দেয়। সংক্ষেপে বলা যায়—এই সব কোষই উদ্ভিদের স্নায়ু।



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

প্রাণীদেহের মাংসপেশীতে যে উত্তেজনার লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়—সেই উত্তেজনাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কতকগুলি পেশী অল্প আঘাতে উত্তেজিত হয় না। আঘাত বাড়িয়া উঠিলে হঠাৎ একটা নির্দিষ্ট গতিতে সাড়া দিয়া উঠে। এই নির্দিষ্ট বেগের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। অন্য কতকগুলি পেশী আছে যাহার উপর অল্প আঘাতেও উত্তেজনা সঞ্চার করা সম্ভব—এবং আঘাতের পরিমাণের তারতম্য ঘটিলে সাড়ায়ও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এই উভয়বিধ পেশীই উদ্ভিদদেহে বর্ত্তমান আছে—ইহা জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর পেশীগুলি প্রাণীদেহের হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি অংশে থাকে—উদ্ভিদের ভিতর ভূমি-আমলা গাছের দেহে এই পেশী আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পেশী প্রাণীদের সাধারণ মাংসপেশী ব্যতীত কিছুই নয়, ইহাদের অনুরূপ জিনিষও অনেক গাছেই আছে।

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রাণীদেহেরই নিজস্ব বিশেষত্ব—ইহা বৈজ্ঞানিক-জগতের বদ্ধমূল ধারণা ছিল। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার এই চির-সমাদৃত বিশ্বাসের মূলে কুঠার হানিয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন—হৃদয় উদ্ভিদেরও আছে—এবং সে হৃদয় স্পন্দিতও হয় প্রাণী-হৃদয়ের মতই। বনচাঁড়াল গাছের পাতায় স্পন্দন দেখিয়া কে আর ইহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ পাইবে ?

মাংসপেশীতে প্রবল স্থায়ী আঘাতের ফলে ঘন সঙ্কোচন ক্রমে ধনুষ্টঙ্কারে পরিণত হইয়া থাকে—ইহা সকলেই জানেন। উদ্ভিদ-



দেহেও ঐ একই কারণে ধনুষ্টঙ্কারের উৎপত্তি হয়—ইহা বহু প্রকারের পরীক্ষা দ্বারা জগদীশচন্দ্র অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে গঠন-সাদৃশ্য ও তাহার উপর বাহ্যিক প্রভাব-সঞ্জাত উত্তেজনার ক্ষমতা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র আরও বহু প্রকারে প্রমাণ করিয়াছেন। কোন প্রকার মাদক দ্রব্য প্রাণিদেহে প্রবিষ্ট হইলে প্রথমে পেশীসমূহে উত্তেজনা ও পরে অবসাদের লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়, এবং বিষ-প্রয়োগের স্থানে পেশী সমূহ প্রথমেই হয় অবসন্ন এবং পরে ক্রমিক আরোগ্যলাভের সহিত সে অবসাদ ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। ঠিক একই প্রকার প্রতিক্রিয়া মাদক ও বিষ দ্রব্যের প্রয়োগ ফলে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের শরীরেও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও পরীক্ষা দ্বারা সত্য বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন।

এই যে নানাভাবে প্রাণী ও উদ্ভিদের ভিতর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়—ইহাতে অনিবার্য্যভাবেই এই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে—প্রাণিরাজ্য ও উদ্ভিদরাজ্য সৃষ্টির বিভিন্ন বিভাগ নহে। উভয়েই এক পরিকল্পনার ও কার্য্যবিধির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতেরা উভয়কে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে করিয়া উভয়ের আইন-কানুনকে পৃথক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহাদেরই সমর্থন কল্পে—কতক প্রমাণ এবং কতক কল্পনা মিশাইয়া সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণে এক তথাকথিত বিজ্ঞান প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মূলগত ঐক্য সম্বন্ধে সজাগ না হওয়ায় প্রাণীদেহ-রহস্য সম্বন্ধে



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

সুপরিজ্ঞাত তথ্যসমূহও তাঁহারা উদ্ভিদ-দেহের রহস্য সমাধানে প্রয়োগ করার কথা চিন্তা করিতে অপারগ হইতেন। যে অর্দ্ধপ্রমাণিত, অর্দ্ধকল্পিত তথ্য তাঁহারা সে রহস্য নিরসন-মানসে নিয়োগ করিতেন, তাহা খঞ্জের হস্তে ভগ্ন যষ্টির ন্যায় খঞ্জকে ভূশায়ী করিবারই সাহায্য করিত। এই জন্য ইহাদের তথ্য-নামধারী কল্পনাসমূহ উদ্ভিদরাজ্যের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গত ব্যাখ্যা কোনদিনই প্রদান করিতে পারে নাই।

আঘাত পাইলে প্রাণীর দেহে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কেন? শরীর-বিজ্ঞানবিদেরা বলেন—উহার কারণ হইতেছে একটা রাসায়নিক ক্রিয়া। প্রাণীর দেহে সর্বদা এক ক্ষয় ও বৃদ্ধি জোয়ার ভাটার ন্যায় খেলা করিতেছে। আঘাত দিলেই ক্ষয় আরম্ভ হয়, এবং কোন এক রহস্যময় স্থান হইতে এক ক্ষতি-পূরণশক্তি আসিয়া ঐ ক্ষয়ের স্থানে নূতন করিয়া শক্তি সঞ্চার করে—ক্ষয় ক্রমশঃ পূরণ হইয়া যায়। আঘাত যদি অতিরিক্তরূপ প্রবল হয়, তবে প্রাণীদেহে অবসাদও আসে নিদারুণ, তাহার ফলে সে ক্ষয় পূরণ হইতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রামলাভ করিলে আহত স্থান পুনরায় শক্তিমান হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। এই যে বিশেষত্ব—ইহা প্রাণী-দেহেরই নিজস্ব নয়—ইহা জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করিয়াছেন; তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই সব নীতি উদ্ভিদদেহের উপরও সমান ক্রিয়াশীল। প্রাণীদেহে অবসাদই বা কেন আসে? বিশেষজ্ঞ

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র



পণ্ডিতগণ বলেন—আঘাতজনিত ক্ষয় পূরক-শক্তির দ্বারা পূরণ হইবার আগেই যদি আবার আঘাত আসিয়া পড়ে, তবে ক্ষয় আর পূরণ হইবার অবকাশ থাকে না, কাজেই ক্ষয়ের পরিমাণ বাড়িয়া চলে, পরিণামে আসে অবসাদ। তাহা ছাড়াও নূতন রক্তপ্রবাহ অবসন্ন স্থানে সঞ্চারিত হইতে না পারিলে, অবসাদ দূর হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে জগদীশচন্দ্র রক্তহীন মাংসপেশীতে আঘাত হানিয়া দেখাইয়াছেন—রক্তময় পেশীর ন্যায়ই তাহা সাড়া দেয়। কাজেই রক্ত প্রবাহের কল্পনা যে একেবারে ভিত্তিহীন, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

জগদীশচন্দ্র যাহা বলেন—তাহা মূলতঃ এই :—আঘাত পাইলেই যে-কোন পদার্থে আণবিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। এই বিকৃতির হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য অণুদের ভিতর একটা প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। বিকৃত অংশের বিপর্যাস্ত অণুগুলি আবার ধীরে ধীরে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া পদার্থটিকে পুরাতন স্বমূর্ত্তি প্রদান করে। কিন্তু বিকৃতি হইতে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে যে সময়টুকু প্রয়োজন—অণুগুলি যদি সে সময় না পায়, বিকৃতি কাটাইয়া উঠিবার পূর্বেই যদি আবার নূতন করিয়া আঘাত আসিয়া পড়ে, তবে বিকৃত অবস্থাই রহিয়া যায়, বিকৃতি দূরও হয় না, বিকৃতি বিকৃততরও হইতে পায় না—অণুসকল তখন হয় অবসন্ন, নিষ্ক্রিয়।



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

জড়পদার্থের উপর উত্তেজনার প্রভাব আসিলে তাহা যে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়—তাহা চিরদিন সকল বৈজ্ঞানিকই জানিতেন। এই সত্যটীকে জড়ের গণ্ডী ছাড়াইয়া জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণী সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন জগদীশচন্দ্র। ইহাতে পদার্থবিদ্যার মূল ধারণাই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে—বলা বলে। সমস্ত পদার্থ—সে জড় হউক, উদ্ভিদ হউক, প্রাণী হউক—যে একই আইনের বশ, সকলের সাড়া দেওয়ার প্রবৃত্তি, রীতি ও শক্তি যে একই আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়—ইহা জগদীশচন্দ্রেরই নব আবিষ্কার। বলা বাহুল্য, এই আবিষ্কারের ফলে জড়পদার্থ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-সমাজের সনাতন ধারার মূলে আঘাত লাগিয়াছে—সকলে পূর্ব ধারণা সংশোধন করিয়া লইবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন—প্রমাণিত সত্যকে যোগ্য মর্য্যাদা দানের জন্য।

———

চার

প্রাণী ও উদ্ভিদের ভিতর আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তিমান যে গতিশীলতা বা আঙ্গিক চলাচল-ক্ষমতা দৃষ্ট হয়—বলিতে গেলে তাহাই সজীব ও নির্জীব পদার্থের ভিতর সর্বপ্রধান পার্থক্য। প্রাণীর ভিতর এই গতিশীলতার প্রধান দৃষ্টান্ত হইতেছে হৃৎ-স্পন্দন। ইহা যে কি কারণে হয় তাহার সন্ধান এখনও সঠিক



পাওয়া যায় নাই। তাই প্রাণী-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, ইহা কোন কারণ হইতে উদ্ভূত নয়—প্রাণীদেহের ইহা একটি স্বাভাবিক ধর্ম।

ইহাকে যদি স্বাভাবিক ধর্মই বলিতে হয়, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় যে, এই ধর্ম শুধু প্রাণীজগতেই সীমাবদ্ধ নহে, উদ্ভিদদেহেও এই স্পন্দন বহুক্ষেত্রে উপলব্ধি করা যায়। বনচাঁড়াল প্রভৃতি কয়েকজাতীয় উদ্ভিদ এ ব্যাপারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রচুর আলোকে যখন বৃক্ষ আরামে অবস্থান করে, তখন তাহার পত্রপুঞ্জে আপনা হইতে একপ্রকার গতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়। পাতাগুলি একবার ওঠে, একবার নামে। এই পর্যাবেক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া পণ্ডিতগণ পূর্বে বলিতেন যে, তাপ ও আলোকের সংস্পর্শই এই সঞ্চালনের হেতু। কিন্তু তাপ ও আলোক ঠিক কি-জাতীয় প্রভাব এই সব উদ্ভিদের উপর প্রয়োগ করে—যাহার ফলে তাহার পাতা এরূপ গতিশীল হইয়া উঠে—তাহা তাঁহারা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন নাই। যে-সব বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তাহার সম্বন্ধে কথা বলিতে হইলেই পণ্ডিতগণ এক অনির্দেশ্য জীবনীশক্তির দোহাই চিরদিনই দিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে—এই জীবনশক্তি যে ঠিক কি বস্তু, তাহা কেহই বুঝাইয়া দেন নাই।

জগদীশচন্দ্র কোন ব্যাপারেই জীবনীশক্তির দোহাই দিতে রাজী হন নাই—তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি মনে করেন,



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

দুর্বোধ্য ও অনির্দিষ্ট কোন শক্তির উপর বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা প্রদানের ভার দিবার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। বাহ্যিক প্রাকৃতিক শক্তি প্রাণী ও উদ্ভিদদেহের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে—তাহাই সকল প্রকার জটিল বিষয়ের সরলতা সমাধানে সক্ষম। এই সমাধানের জন্য প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহে বিরাজমান কোন রহস্যময় অজ্ঞেয় শক্তি লইয়া টানাটানি করার প্রয়োজন দেখা যায় না। এই যে স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত স্পন্দন—যাহা প্রাণীদেহে হৃৎস্পন্দনরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং উদ্ভিদজগতের কোন কোন অধিবাসীর দেহে পাতার উঠা-নামার আকারে দেখা যায়—তাহাও জীবনীশক্তির ক্রীড়া বলিয়া অজ্ঞতা প্রকাশের কোন আবশ্যক দেখা যায় না। সুপরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক-নীতির ক্রিয়া দ্বারাই ইহা সংঘটিত হয়—ইহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। জগদীশচন্দ্র বলেন, দেহের উপর বাহির হইতে আঘাত আসিলে তাহার উত্তরে দেহ সাড়া দেয়। এই সাড়া ক্ষেত্রবিশেষে একটিমাত্র, অন্য ক্ষেত্রে একাধিক হয়। আঘাতের প্রাবল্য খুব অসাধারণ হইলে—তাহার উত্তরে আহত স্থান ক্রমাগত বহুক্ষণ ধরিয়া একটির পর একটি ধারাবাহিক সাড়া দিতে পারে। তিনি ইহাকে Multiple Response বা ধারাবাহিক সাড়া নামে পরিচিত করিয়াছেন। একটা দোলনাকে দুলাইয়া দাও। একটা ধাক্কাতে সে যে মাত্র একবারই দুলিবে, তাহা নয়। ক্রমাগত সে দুলিতেই থাকিবে। অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণ সে ধারাবাহিক ভাবে বার বার করিতে থাকিবে।



এই ধারাবাহিক সাড়া বনচাঁড়াল প্রভৃতি কতিপয় গাছেই সুস্পষ্ট দেখা যায়। পাতার ডগায় তাপ প্রয়োগ করিলে তাহা একবার গুটাইয়া আবার খুলিবে এবং তারপর আবার নূতন করিয়া গুটাইতে থাকিবে। এই ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি বার বার চলিতে থাকিবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—এই ধারাবাহিক সাড়া সমস্ত উদ্ভিদে সমানভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না কেন? ইহার উত্তর পূর্বে প্রসঙ্গান্তরে আরও একবার দেওয়া হইয়াছে। বনচাঁড়াল প্রভৃতি গাছের পাতার নীচে যে Pulvinus নামক বস্তুটি আছে, তাহার সাহায্যে এই উত্তেজনা প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। আম, কাঁঠাল বা অন্যান্য উদ্ভিদের পাতায় ঐ যন্ত্রের অসদ্ভাব ও অপরিণত অবস্থা এই উত্তেজনার প্রত্যক্ষ প্রকাশের পক্ষে অনুকূল নয় বলিয়া—যদি এরূপ মনে করা হয় যে, তাহাদের ভিতর এ উত্তেজনায় সাড়া আসে না—তবে তাহা ভুল করা হইবে।

যে সমস্ত উদ্ভিদে সঞ্চালন ক্ষমতা স্বতঃস্ফূর্ত, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই ধারাবাহিক উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়—ইহা জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তবে এ পরীক্ষা ফলপ্রদ হয় সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সতেজ গাছের উপরে। নিস্তেজ গাছে আঘাত করিলে তাহা একটিমাত্র সাড়াই উৎপন্ন করে। ধারাবাহিক সাড়ার উৎপাদনে তেজোহীন উদ্ভিদ অক্ষম।

জগদীশচন্দ্র বলেন—বাহিরের তাপ ও আলোক হইতে উদ্ভিদ যে শক্তি সংগ্রহ করে, তাহা একবারের সাড়াতেই সম্পূর্ণ ব্যয়িত



আচার্য জগদীশচন্দ্র

হইতে পারে না। কাজেই সে শক্তির কতকটা অংশ উদ্ভিদের দেহেই থাকিয়া যায়। এখন সে শক্তির কাজ হইতেছে, সাড়া জাগানো, যতক্ষণ সে শক্তির বিন্দুমাত্র অবশেষ থাকিবে, ততক্ষণ সাড়া জাগিতেই থাকিবে উদ্ভিদের দেহে। কাজেই সাড়ার পর সাড়া ধারাবাহিকভাবে চলিবেই, প্রাণীদেহের হৃৎস্পন্দনের মত, এবং এ স্পন্দন কোন প্রাণশক্তির বহিঃস্ফূর্ত্তি নয়।

এক্ষণে উদ্ভিদের রস গ্রহণের কথা আলোচনা করা যাউক। এ দিক দিয়াও জগদীশচন্দ্রের দান সামান্য নহে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও বৈজ্ঞানিক-সমাজে এ সম্বন্ধে অতি অনিশ্চিত দুর্বোধ্য ব্যাখ্যা সকল সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে প্রধান হইতেছে, বায়ু-চাপের কথা। পৃথিবীর উপর যে বায়ুমণ্ডল বিরাজ করিতেছে, তাহা প্রায় পঞ্চাশ ষাট মাইল গভীর। ইহা সর্বদাই ভূপৃষ্ঠের উপর প্রবল চাপ দিতেছে। আমরা এই বায়ুমণ্ডলে ডুবিয়া আছি বলিয়া ইহার চাপ বুঝিতে পারি না—যেমন জলের ভিতরকার মাছ জলের চাপ বুঝিতে অক্ষম। বায়ুর চাপ বুঝিতে পারা যায়—বায়ুশূন্য স্থানে বায়ুশূন্য পাত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিলে। কোন পাত্র হইতে বায়ু বাহির করিয়া দিয়া উহার মুখ যদি কোন তরল পদার্থে ডুবাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ তরল পদার্থটী শূন্য পাত্রে প্রবেশ করিতেছে। কেন এরূপ হয়? পাত্রের বাহিরে তরল পদার্থ রহিয়াছে—তাহা ভিতরে প্রবেশ করে কেন? উত্তর—বায়ুর চাপে এরূপ হয়। পাত্রের



বাহিরে তরল পদার্থটির উপর বায়ুর চাপ পড়িতেছে এবং সেই চাপের বশে উহা পাত্রের ভিতর ঢুকিতে বাধ্য হইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণের মতে উদ্ভিদের রস গ্রহণও এই নিয়ম অনুসারে সাধিত হয়। সূর্য্যতাপে গাছের রস বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়—গাছের ভিতর হইয়া যায় শূন্য। মাটির রস তখন বাহিরে রহিয়াছে। উহার উপরে পড়িতেছে বায়ুর চাপ। চাপের বশে তরল রস বৃক্ষের শূন্য স্থান দখল করিবার জন্য ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। ইহাই বৃক্ষের রস শোষণ, যদিও শোষণ-ক্রিয়ার ভিতর বৃক্ষের নিজ কৃতিত্ব অত্যন্ত সামান্য। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র কিন্তু এ ব্যাখ্যাকে সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, বায়ুর চাপের সীমা আছে। ৩৪ ফুট হইল সেই সীমা। ভূপৃষ্ঠে বিরাজিত বায়ুমণ্ডলের শক্তি কোন তরল পদার্থকে ৩৪ ফুটের অধিক উপরে তুলিতে পারে না। কাজেই বায়ুর চাপই যদি বৃক্ষের রস গ্রহণের মূল কারণ হইত তাহা হইলে বৃক্ষের কাণ্ডের ৩৪ ফুট উচ্চতা পর্য্যন্তই সে রস সঞ্চারিত হইতে পারিত। তাহার উপরের কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা রসহীন শুষ্ক জীর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা ত হয় না। ৩৪ ফুট অপেক্ষা বহু বহু পরিমাণে উচ্চতর বৃক্ষের উচ্চতম অগ্রভাগেও রসের অস্তিত্ব পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। সুতরাং বায়ুস্তরের চাপ যে উদ্ভিদের রস শোষণকে সম্ভব করিয়াছে, তাহা স্বীকার করা যাইবে কিরূপে ?

রস শোষণের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হইতেছে এইরূপ :—জলে



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

যদি একটা সরু নলকে ডুবাইয়া ধরা যায়, তাহা হইলে নলের মুখ দিয়া জল অনেকটা ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। কাপড়ের একটা দিক জলে ডুবাও—কি দেখিবে? যে অংশ ডুবিয়া নাই, তাহারও খানিকটা ক্রমে ভিজিয়া উঠে। কেন এরূপ হয়? উত্তর:—কাপড়ের সূতায় বা নলের ভিতর সরু আঁশ আছে। তাহারই ভিতর দিয়া জল উর্দ্ধগামী হয়। বৃক্ষের রস শোষণ ব্যাপারটাও এইরূপ বলিয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন। তাঁহারা বলেন—শিকড় থাকে মাটির রসের ভিতর ডোবানো। গাছের ভিতর সরু নলের অভাব নাই। তাহারই ভিতর দিয়া মাটির রস উপরে উঠিয়া গাছের অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিত হয়।

এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হইতে পারিত—যদি-না দুর্ভাগ্যক্রমে রসের এভাবে উর্দ্ধগমনেরও একটা সীমা থাকিত। কিন্তু বৃক্ষের দেহে রসের উর্দ্ধগমনের কোন সীমা নাই। এ অবস্থায় এই ব্যাখ্যাকে সমীচীন ও যুক্তিসহ বলিয়া জগদীশচন্দ্র স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই।

তৃতীয় ব্যাখ্যা হইতেছে এইরূপ:—গাছের ভিতরও রস আছে, বাহিরে মাটির ভিতরও রস আছে। এই দুই রসের গাঢ়তা একরূপ নহে। গাঢ়তা যেখানে এক নহে, সেখানে ভিতরের সচ্ছিদ্র ব্যবধান ভেদ করিয়া উভয় রসের একত্র হইবার প্রবৃত্তি বিজ্ঞানসঙ্গত ও স্বাভাবিক। এই ধর্মবশে বাহিরের রস গাছের ভিতরে প্রবেশ করে, ইহাই গাছের রস শোষণ।



জগদীশচন্দ্রের মতে এই মতও ভ্রান্ত, কারণ বিভিন্ন গাঢ়তার রস পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করে সত্য, কিন্তু সেই প্রয়াসের গতি এত মন্থর যে, শুধু তাহাই রসশোষণের একমাত্র হেতু হইলে সেই শোষিত রসের সহায়তায় কোন বৃক্ষই বাঁচিতে পারিত না।

অন্য একটি ব্যাখ্যা হইতেছে মূলের চাপ। কিন্তু ইহার যে সত্যকার অর্থ কি, তাহাই কোন বৈজ্ঞানিক বুঝাইতে পারেন নাই। সুতরাং ইহাকে অনায়াসেই হিসাব হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

আরও একটি মত আছে। তাহা এই :—পাতার ভিতরে কোষ আছে অসংখ্য। তাহার ভিতরকার রস সূর্য্যতাপে বাষ্প হইয়া যায়। তাহার ফলে বৃক্ষদেহস্থ রস ঐ সকল পত্র-কোষে প্রবেশ করিতে থাকে। ইহাই রস শোষণ।

জগদীশচন্দ্র বলেন—ইহাই যদি সত্য হইত, তবে পাতার রস বাষ্পে পরিণত হওয়া বন্ধ হইলে রস শোষণও অবশ্য বন্ধ হইত। কিন্তু তাহা ত হয় না। রস শোষণ সর্বদা সর্ব অবস্থায়ই চলিতে থাকে—পাতার রস বাষ্পে পরিণত হউক বা না হউক। বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পেফের তাঁহার Physiology of Plants নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলিয়াছেন—"উদ্ভিদ কোন্ শক্তির বলে ও কোন্ উপায়ে মৃত্তিকা হইতে রস সংগ্রহ করে, সে বিষয়ে বহু বহু মত প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহার কোনটিকেও প্রামাণ্য



বা যুক্তিসহ বলা চলে না। ইহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই রস শোষণের প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিবার মত জ্ঞান আমাদের নাই। যতই-না কেন নব নব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকুক, যতই-না কেন কল্পনা ও গবেষণা এ রহস্যের সমাধানকল্পে প্রযুক্ত হইয়া থাকুক—মূল সত্যটি এখনও অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গিয়াছে। কাজেই একটি মাত্র কথাই আমাদিগকে বলিতে হয়—তাহা এই যে, ইহা গাছের প্রাণশক্তির একটা ক্রিয়া। ইহা ছাড়া বলিবার আর কিছুই নাই।”

আর একজন বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ্যাবিদ ষ্ট্রামকুর্গারও এই বিষয় লইয়া বহু আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার পরীক্ষাগুলি সবই নিস্ফল হইয়াছে। তিনি গাছের গুড়ির নীচের দিকের কোষগুলিকে আগুনে পোড়াইয়াছিলেন—তাহাদিগকে প্রাণশক্তিবিহীন করিবার জন্য। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, নিষ্প্রাণ কোষের ভিতর দিয়াও গাছের রসশোষণ ক্রিয়া অব্যাহত রহিয়া গেল। মূল হইতে শাখা-প্রশাখা বাহিয়া গাছের রসপ্রবাহ যথারীতি গাছের সর্বাঙ্গে পৌঁছিতে থাকিল। দ্বিতীয়তঃ—তিনি গাছের ত্বকচ্ছেদন করিয়া কর্ত্তিত স্থানে বিষপ্রয়োগ করিলেন, তাহাতেও রস শোষণ ব্যাহত হইল না। কাজেই পেফের সাহেবের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণই ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। কোষের সক্রিয়তার উপর যে রস শোষণ-শক্তি কোনক্রমেই নির্ভর করে না, তাহা অবিসংবাদিতরূপে সপ্রমাণ হইল। Text-book of Botany

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র



গ্রন্থে তাই ষ্ট্রামকুর্গার সাহেব স্বীকারই করিয়াছেন—"রস শোষণের মূলে যে গাছের প্রাণবান কোষগুলিরই ক্রিয়া রহিয়াছে—ইহা আর বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া প্রচার করার উপায় নাই।"

প্রচলিত মতবাদগুলি যে সবই ভ্রান্ত, তাহা একে একে প্রমাণ করিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্র নিজে কি ব্যাখ্যা দিতেছেন—তাহা এক্ষণে দেখা যাউক। সেই সাড়ার কথাই আবার আসিয়া পড়ে। গাছের কোন অঙ্গে আঘাত দাও—সাড়া জাগিবে। কতকগুলি গাছে এই সাড়া প্রত্যক্ষ করা যায়, কতকগুলিতে যায় না, কিন্তু না গেলেও তাহার অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক-উপায়ে বুঝিতে পারা যায় অনায়াসেই। যাহা হউক, এই সাড়া অনেক সময়ে আবার ধারাবাহিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

স্বতঃস্ফূর্ত্ত গতিশীলতা উৎপাদনের জন্য যে প্রতিবারেই বৃক্ষের দেহে আঘাত বা অন্য উপায়ে উত্তেজনা সঞ্চারের প্রয়োজন হয়, তাহা আদৌ নয়। অনেক সময়েই এই উত্তেজনা আসে তাপ বা আলোকের সংস্পর্শে—নিতান্ত সাধারণ প্রাকৃতিক উপায়ে।

গাছের গোড়ায় যদি এই ধারাবাহিক সাড়ার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে কি হইবে? সাড়ার প্রথম ফলই হইতেছে এক কোষ হইতে অন্য কোষে রসপ্রবাহ। দ্বিতীয় ফল হইতেছে অণুবিন্যাসের বিপর্য্যয়। এখন ধরা যাউক—এক কোষ হইতে অন্য কোষে রসের চলাচল সুরু হইল। প্রথম কোষে কাজেই



আচার্য জগদীশচন্দ্র

রসের অভাব ঘটিবে। অভাব হইলেই তাহা পূরণ করার চেষ্টা আসে। নির্জীব পদার্থেও আসে। পুকুরের এক ঘটি জল যেখান হইতে তুলিয়া লইলাম, সে জায়গা শূন্য রহিল না। চারিপাশ হইতে জল আসিয়া শূন্যকে নিমেষে পূর্ণ করিয়া দিল। উত্তাপে কোন স্থানের বায়ু ঊর্দ্ধগামী হইল। চারিপাশ হইতে ঝটিকা-বেগে বায়ু আসিয়া শূন্য স্থানকে ভরাট করিয়া ফেলিল। নির্জীব পদার্থেও এই গতিশীলতা, পূরণপ্রবৃত্তি সর্বদাই দৃষ্টিগোচর হইবে। একটা কোষ রসশূন্য হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য স্থান হইতে তাহাতে রসের আমদানী হইবে। মূলের চারিদিকেই রস ছড়ানো রহিয়াছে মৃত্তিকার ভিতর। এখন মূলস্থ কোষগুলি রসশূন্য হইয়াছে, কি এই মৃত্তিকাশ্রিত রস স্বতঃ আসিয়া শূন্য কোষকে পূর্ণ করিবে। আবার সে রস কোষকে শূন্য করিয়া যখন উপর দিকে চলিয়া যাইবে, তখন নূতন করিয়া আবার রস বৃক্ষকোষে সঞ্চারিত হইবে মৃত্তিকা হইতে। এই পৌনঃপুনিক প্রাকৃতিক ক্রিয়াকেই বলা হয় রস শোষণ।

এখন এ বিষয়ে একটিমাত্র সন্দেহের ক্ষেত্র থাকিয়া যাইতে পারে। তাহা এই—মূলেই উত্তেজনার প্রাদুর্ভাব ঘটিবে কি কারণে ? ইহার উত্তর—উত্তেজনা আসে আঘাতে। মূলের চারিদিকে কঠিন মাটি। অনবরত সেই মাটি ঘর্ষণ করিতেছে ও চাপ দিতেছে মূলকে। তাহারই ফলে আসিতেছে উত্তেজনা। এই উত্তেজনা নীচে হইতে গাছের উপর দিকে সঞ্চারিত হয়—রসও সেইজন্য নীচে হইতে প্রবাহিত হয় উপর দিকে।



পাঁচ

এই রসপ্রবাহের দ্বারা বৃক্ষদেহে আরও একটি অতি উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সাধিত হয়—বৃক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। কি প্রকারে ইহা ঘটে, এইবার তাহাই আলোচনা করা যাউক।

উত্তেজনা লাভ করিলেই উত্তেজিত অংশ হইতে ক্রমে ক্রমে রস অন্য দিকে চলাচল করিতে আরম্ভ করে—এই চলাচলের সহিত তাল রক্ষা করিয়া গাছের সেই সেই অংশ প্রসারিত ও কুঞ্চিত হইতে থাকে। প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষদেহের সার কিয়ৎপরিমাণে প্রসারিত অংশে সঞ্চিত হইয়া যায়। তাহারই ফলে, রস সঞ্চলন বন্ধ হইয়া গেলেও বৃক্ষের প্রসারিত অংশটি আর পুনরায় আকুঞ্চিত হইতে পারে না। এইরূপে গাছ তিলে-তিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

এখন প্রশ্ন এই—গাছের এই উত্তেজনা আসে কোথা হইতে? আসে আঘাত, ঘর্ষণ, বা তদভাবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাপ, আলোক বা বায়ুর সংস্পর্শ হইতে, গাছের পাতা বাতাসে নড়িলে, বা একটি পাতার গায়ে অন্য একটি পাতার ঘষা লাগিলে উত্তেজনার সৃষ্টি ও সাড়ার উদ্ভব হয়। পূর্ব হইতে যে শক্তি বৃক্ষদেহে সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সাড়ার ধারাবাহিকভাবে পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে। ইহার ফলে আসে রস সঞ্চলন ও তাহা হইতেই গাছের বৃদ্ধি।

এই রহস্য পূর্ব যুগের উদ্ভিদশাস্ত্রবিশারদগণের ঠিক সুপরিজ্ঞাত



ছিল না। তাঁহারা বলিতেন, রস শোষণ, বৃদ্ধি ও অন্য সবই বৃক্ষের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করে। এই প্রাণশক্তিটা কোথা হইতে আসে ও ইহার স্বরূপ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে ঐ বৈজ্ঞানিক মহাশয়েরা নীরব হইয়া যাইতেন। এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে সক্ষম হইয়াছেন, এতদিন পরে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র। তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বৃক্ষের উত্তেজনা হইতে আসে সাড়া। উত্তেজনা প্রবল হইলে ঐ সাড়া হয় ধারাবাহিক। উহা হইতে আসে রসপ্রবাহ—তাঁহারই ফল উদ্ভিদদেহের বৃদ্ধি।

এখন সমস্ত প্রক্রিয়াটার মূল, হইল উত্তেজনা। এই উত্তেজনা প্রায় সবই আসে তাপ বা আলোকের সংস্পর্শ হইতে। কাজেই তাপ বা আলোক হইতে যে-শক্তি উদ্ভিদ নিজদেহে আত্মসাৎ করে, সেই শক্তিই তাহার বহুবিজ্ঞাপিত কিন্তু রহস্যাবৃত প্রাণশক্তি (Inner stimulus.)

এখন উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলিবার আছে। সকল উদ্ভিদ একই প্রকারে বা একই আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। এ বিষয়ে বৈচিত্র্য আসে কোথা হইতে?

Gravity বা ভূমধ্য আকর্ষণ গাছের বৃদ্ধি ও পরিণতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বিদ্বৎ-সমাজে একথা বহুদিন হইতে বিদিত। জীবতত্ত্ববিদ ডারউইন এ মতের প্রধান সমর্থক। কিন্তু এই আকর্ষণ যে ঠিক কী নীতিতে উদ্ভিদ দেহের বৃদ্ধিকে নিয়মিত বা প্রভাবিত করে, তাহার সঠিক বিবরণী কেহ দিতে



আচার্য জগদীশচন্দ্র

পারেন নাই। ব্যাপারটা রীতিমত দুর্বোধ্য ও জটিল। ডাল চেষ্টা করে উপরদিকে মাথা তুলিবার। শিকড় চেষ্টা করে নীচের দিকে নামিবার। অথচ এই উভয়বিধ গতিরই কারণ নির্দেশ করা হইয়াছে মাধ্যাকর্ষণ। ডারউইন স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন, "ইহা সহজেই বলিতে পারি যে, এই উভয়বিধ গতিরই মূল কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ। কিন্তু কি কারণে একই শক্তি উদ্ভিদ দেহের দুইটি বিভিন্ন অবয়বের উপর বিভিন্নমুখী প্রভাব বিস্তার করে, তাহা বলা যায় না।

এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে প্রথমেই বিবেচনা করা দরকার যে, পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে উদ্ভিদ-দেহে কি জাতীয় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

জিনিষের পরিমাণের উপর তাহার ভার নির্ভর করে। কিন্তু ভারকে ভার বলিয়া অনুমান করিতে পারি আমরা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবেই। সুতরাং গাছের কোষ কি পরিমাণ ভারী—তাহা বুঝিতে পারিলেই উদ্ভিদ-দেহের উপর পৃথিবীর আকর্ষণের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিতে পারে।

এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা দুইটি পৃথক মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। একটি মত এই যে, উদ্ভিদ-দেহের কোষসমূহে সংগৃহীত রসপদার্থ উদ্ভিদ-দেহের সকল অঙ্গে সমান চাপ দেয় না, উপরে ও নীচে চাপের পরিমাণে তারতম্য ঘটে। এই তারতম্যের ফলে উত্তেজনার পরিমাণও বিভিন্ন কোষের উপর



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

বিভিন্ন রূপ হয়। ইহাকেই পৃথিবীর আকর্ষণের উত্তেজনা বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় মতটি এই যে, পৃথিবীর টান পাশাপাশিভাবে কোন জিনিষকে টানে না। কাজেই শায়িত যে-কোন বস্তুর উপর চাপ বাহিরের দিকে বেশী ও ভিতরের দিকে কম পরিমাণেই পড়ে। উদ্ভিদকোষের ভিতর দিকে উত্তেজনার পরিমাণ বাহিরের উত্তেজনার সমান নয়। কাজেই পৃথিবীর আকর্ষণে উদ্ভিদদেহের এক অংশ অন্য অংশ অপেক্ষা বেশী উত্তেজিত হইয়া উঠে।

এই দুইটি সিদ্ধান্তই সঙ্গত, তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর আকর্ষণে উদ্ভিদদেহকে উত্তেজিত করে—ইহাও সত্য, এবং সেই আকর্ষণ যে নানা আকারে বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে—ইহাও নিঃসন্দেহ। কিন্তু উদ্ভিদদেহের বৃদ্ধি ও গঠনবৈচিত্র্য যে কি প্রকারে ঐ আকর্ষণী-শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা ঠিক বুঝা যায় না।

গাছের ডাল মাটির উপর শুইয়া পড়িলে তাহার মাথা উপরের দিকে উঠিতে চেষ্টা করে—ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত প্রত্যক্ষ সত্য। পণ্ডিতগণ বলেন—ডালের যে দিকটা মাটিতে লাগিয়া থাকে, তাহা পৃথিবীর আকর্ষণ বেশী পায় এবং সেই উত্তেজনায় উপরের দিকে বাড়িয়া চলে।

কিন্তু পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, উত্তেজনা দ্বারা উদ্ভিদদেহে আণবিক-বিকৃতি সৃষ্টি হইলে তাহা গাছের বৃদ্ধির সাহায্য ত



করেই না, বরং বৃদ্ধিকে ব্যাহত করিবার চেষ্টাই করে। উত্তেজনার ফলে একটি কোষ হইতে অন্য কোষে রস সঞ্চার ঘটিতে থাকে। এই রসপ্রবাহ যে সাড়ার উৎপত্তি করে, তাহাই উদ্ভিদদেহের বৃদ্ধি ঘটায়। কাজেই কোষমধ্যে সংগৃহীত রস বা অন্য পদার্থের চাপই যদি শায়িত বৃক্ষশাখার সোজা হইয়া উঠার জন্য দায়ী হইত, তবে—বৃদ্ধি রোধ হওয়াটাই ঐ সোজা হওয়ার কারণ—এইরূপ ধারণা করা অনিবার্য্য হইয়া পড়িত। কাজেই এ সিদ্ধান্ত যে একেবারে সত্য, তাহা বলা চলে না।

একটা ভূশায়ী ডাল যদি ধনুকের মত বাঁকিয়া মাথা তুলিয়া উপরের দিকে বাড়িয়া উঠে, তাহা হইলে দুইরূপ ধারণা করা সম্ভব। প্রথম—গাছের ভূশায়ী অংশটা উপরের অংশ অপেক্ষা বেশী বাড়িতেছে। দ্বিতীয়—উপরের অংশ মোটেই বাড়িতেছে না, নীচের দিকটা বাড়িয়া চলিয়াছে। জগদীশচন্দ্র এ বিষয়ে বহু গবেষণা করিয়া অবশেষে এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাকেই প্রামাণ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

গাছের কাণ্ড উপরের দিকে বাড়ে কেন? এবং গাছের শিকড় নীচের দিকে চলে কেন? ইহার উত্তরে পূর্ব পণ্ডিতগণ বলিতেন—যাহার যাহা ধর্ম—সে তাহা ত করিবেই! কাণ্ডের নিজস্ব ধর্ম হইতেছে উপরের দিকে যাওয়া, এবং শিকড়ের নিজস্ব ধর্ম হইতেছে নীচের দিকে নামা—তাহারা তাহাই করে!



এ তথ্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে উদ্ভিদদেহে সেই কল্পিত প্রাণশক্তির আরোপকে মানিয়া লইতে হয়—যাহাতে জগদীশচন্দ্র চিরদিনই অনিচ্ছুক। তিনি নিজের পথে এই সমস্যার কিরূপ সমাধান করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে দেখা যাউক।

লজ্জাবতী প্রভৃতি কোন কোন উদ্ভিদের দেহে কোথাও আঘাত লাগিলে তজ্জনিত উত্তেজনায় সেই অংশটি প্রথমতঃ নামিয়া পড়ে—পরে ধীরে ধীরে উচু হইয়া পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। আঘাতের পরেই আহত অঙ্গে আণবিক-বিন্যাস বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, তাহারই ফলে পাতার অবনমন সংঘটিত হয়—ইহাই জগদীশচন্দ্রের মত। আণবিক-বিকৃতি ঘটে না কেবল তখনই, যখন কোন কারণে অণুগুলি অসাড় হইয়া থাকে। লজ্জাবতী-লতায় খুব ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শ লাগিলে আর কোন আঘাতেই তাহাতে উত্তেজনা বা উত্তেজনাজনিত সাড়া জাগিবে না—পাতাও নামিবে না। কাজেই ইহা স্বীকার্য্য যে, উদ্ভিদদেহে উত্তেজনার সাড়া বন্ধ করিতে হইলে ঠাণ্ডা দেওয়াই একমাত্র উপায়। এক্ষেত্রে ভূশায়িত গাছের ডালের কোন্ দিকে উত্তেজনার সাড়া রহিয়াছে, কোন্ দিকে নাই—তাহা বুঝিবার প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে ঠাণ্ডার প্রয়োগ। এই পরীক্ষা দ্বারা জগদীশচন্দ্র দেখিয়াছিলেন যে, ডালের উপর দিকে ঠাণ্ডা লাগিবামাত্র তাহা বাঁকিয়া গিয়াছে। কাজেই ডালের উপর দিকটার উপরই যে পৃথিবীর আকর্ষণ প্রভাব বিস্তার করে—তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

পূর্ব পণ্ডিতগণ ডাঁড়ির ঊর্দ্ধগমন ও শিকড়ের অধোগমনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন যে, ওগুলি তত্তৎ অঙ্গের বিশেষ ধর্ম। কিন্তু এই ব্যাখ্যাকে জগদীশচন্দ্র স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি যেভাবে পরীক্ষা করিয়া এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

উদ্ভিদদেহে উত্তেজনার ফলে দুইটি বিভিন্নরূপ সাড়া একসঙ্গেই উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ—আহত স্থান হইতে রসপ্রবাহ বহিতে আরম্ভ করে ও তাহার জন্য একটা সাড়া আসে। দ্বিতীয়তঃ—আঘাতে আণবিক বিকৃতি আসে ও তাহাতে সাড়ার সৃষ্টি হয়। এখন এই দুইটি সাড়া একই সময়ে চলিতে সুরু করে বটে, কিন্তু দুইটির গতি সমান নহে। রসপ্রবাহজনিত সাড়া দ্রুত, ইহারই ফলে গাছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আণবিক বিকৃতিজাত সাড়ার গতি অপেক্ষাকৃত মন্দ—এবং ইহার ক্রিয়াও বৃক্ষদেহের বৃদ্ধির পরিপন্থী। যে-কোন উদ্ভিদের দেহে আঘাত করিলেই বৈদ্যুতিক পরীক্ষায় এই দ্বিবিধ সাড়ার গতি ও প্রকৃতির তারতম্য ধরা পড়িবে।

এই উভয়বিধ সাড়ার সংঘাত যে উদ্ভিদদেহে কত মত বিচিত্র আকার-ভেদের সৃষ্টি করে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। নানারূপ পরীক্ষায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, কখনো রসপ্রবাহ, কখনো প্রকৃত উত্তেজনাস্রোত প্রাধান্য পাইয়া গাছের ডাল-



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

পালাকে অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবে ধাঁকাইয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ শিকড় ও কাণ্ডের উপর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের আরোপ করার যে কোন সঙ্গত কারণ নাই—তাহা জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ফলে পরিপূর্ণ-ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার মতে শাখা ও মূলে একই ধর্ম বিদ্যমান, উভয়ের ভিতর যে ভিন্নরূপ কাজ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে আছে পৃথিবীর আকর্ষণ। ঐ আকর্ষণের ফলে একদিকে উৎপন্ন হয় রসপ্রবাহ, অন্যদিকে হয় উত্তেজনার সৃষ্টি। পরস্পরে সংঘর্ষ বাধে। সেই সংঘর্ষের ফলে উদ্ভিদের এক এক অংশ এক এক ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কখনো শিকড় বাঁকিয়া মাটিতে প্রবেশ করে, কখনো গুঁড়ি বাঁকিয়া উপর দিকে ওঠে। অথচ পূর্ববর্ত্তী বিজ্ঞানবিদগণ শিকড় ও গুঁড়ির ভিন্ন ধর্ম কল্পনা করিয়া কত না পণ্ডশ্রম করিয়া গিয়াছেন! একই সাধারণ ধর্ম উভয়কে পরিচালিত করে। সে ধর্ম হইতেছে আণবিক-বিকৃতি। এই বিকৃতিরই পরিণাম সকল জড়পদার্থে নানাভাবে দেখা দিয়া ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয়।

এখন এই আণবিক-বিকৃতির যাহা মূল কারণ, সেই উত্তেজনার সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা যাউক। উত্তেজনার মূল হইতেছে, আঘাত। সে আঘাত অধিকাংশ সময়েই তাপ ও আলোকের সংস্পর্শজনিত। আলোকের স্পর্শ লাভ করিলে ডাল ও পাতা বহু প্রকারে তাহাতে সাড়া দেয়। তাহাদের ওঠা-নামা সঙ্কোচ-প্রসার সেই সাড়ারই প্রত্যক্ষ বিকাশ। কখনো একখানা ডাল

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র



আলোকের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, কখনো-বা আলোক হইতে ভিন্নদিকে অপসৃত হইবার চেষ্টা করিতেছে। কখনো অন্ধকার পাইলেই গাছের পাতা জুড়িয়া গুটাইয়া যায়, কখনো-বা সেই গুটাইয়া যাওয়া ব্যাপারটা প্রচণ্ড দিবালোকেই ঘটিতে দেখি।

আলোকের স্পর্শ উদ্ভিদদেহে কিভাবে কি পরিবর্ত্তন আনে, তাহা পূর্ব পূর্ব বৈজ্ঞানিকেরা ধরিতে পারেন নাই। তাঁহাদের যাহার যাহা মনে হইয়াছে—তাহাই সত্য বলিয়া নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ ও প্রচার করিয়া তাঁহারা কেবল পুঁথি বাড়াইয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের গবেষণা কোন সমস্যারই সমাধান করিতে পারে নাই। সে সমাধান প্রতীক্ষা করিয়াছিল আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্রের জন্য। তিনি এ বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করিবার পরেই জটিলতম বিষয়ও সহজবোধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই পূর্ব পণ্ডিতগণের মতবাদগুলির ভ্রম নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

ঐ সকল পণ্ডিত আলোকজনিত উত্তেজনার কোন সার্থকতা, হেতু বা পদ্ধতি বুঝিতে পারেন নাই। আলোকপাতে উদ্ভিদের দেহে যে বহুবিধ পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হয়, তাঁহারা তাহার ভিতর কোন শৃঙ্খলা দেখিতে পান নাই। ফলে কতকগুলি অহেতুক অবান্তর কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে গবেষণা শেষ করিতে হইয়াছে। জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, তাপ, আলোক



প্রভৃতির সংস্পর্শে বৃক্ষশরীরে উত্তেজনার সঞ্চার হয়। ঐ উত্তেজনা একই নিয়মাধীন। তাপ ও বিদ্যুৎ এবং আলোক একইরূপ সাড়ার উৎপাদন করে।

কতকগুলি গাছের পাতা সন্ধ্যার সময় নিমীলিত অবস্থায় থাকে। আবার সেই ঘটনাই দেখা যায় প্রখর দিবালোকের সময়ও। এই ব্যাপারের কারণ কেহই বুঝাইতে পারেন নাই। ডারুইন বলিয়াছেন—গাছ প্রখর আলোক সহ্য করিতে পারে না, তাই দ্বিপ্রহরের সময় পাতা গুটাইয়া নিদ্রা দেয়। ইহা যে একান্ত হাস্যকর ব্যাখ্যা, বা ব্যাখ্যা নামের অযোগ্য অর্থহীন উক্তি, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। জগদীশচন্দ্র বলেন—পত্রমূলযুক্ত উদ্ভিদেরাই এইরূপ দিবানিদ্রাতুর। প্রত্যেক পত্রমূলেরই উপরের দিকটা হইতে নীচের দিকটা অধিক উত্তেজনাপ্রবণ। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্র যখন পত্রমূলের উপরের দিকে পতিত হয়, তখন তাহা আড়াআড়ি চলিতে থাকে, নীচের অংশে পৌঁছায় না। উপরের দিকটা কাজেই বক্রভাব প্রাপ্ত হয় এবং পাতাগুলি জোড় বাঁধিতে আরম্ভ করে। পালিতা-মাদার, অপরাজিতা লতা প্রভৃতি এই শ্রেণীর উদ্ভিদ। দিবালোকে ইহাদের পত্রমূল (Pulvinus) বক্রভাব প্রাপ্ত হয় এবং পাতাগুলি উঁচু হইয়া ওঠে। অনেক সময়ে সূর্য্যের অবস্থানের দিকে মুখ করিয়া পাতাগুলি নিমীলিত হয়।

এইরূপ ঊর্দ্ধমুখে নিমীলিত হওয়ার স্বভাব অবশ্য কম



উদ্ভিদেই দৃষ্টিগোচর হয়। অধিকাংশ উদ্ভিদই নিমীলনের সময়ে মুখ নীচের দিকে অবনত করে। ইহারই বা হেতু কি? আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বলেন—ইহাদের পত্রমূলের সঞ্চালনী-শক্তি প্রবল। পত্রমূলের উপরে আলোকপাত ঘটিলে তাহা নিম্নদিকেও প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। যেহেতু এই নিম্নভাগের উত্তেজনা-প্রবণতা অধিক, সেইজন্য পত্রমূলগুলি আনত হইয়া পড়ে, পাতাগুলিও সঙ্গে সঙ্গেই হয় অবনত। এইরূপ কতকগুলি উদ্ভিদ হইতেছে—লজ্জাবতী, শিরীষ, আমরুলি ইত্যাদি; ইহারা প্রত্যেকেই দিবানিদ্রাশীল। প্রভাতে ইহাদিগকে নিমীলিত দেখা যায় না। কিছুক্ষণ আলোকের সংস্পর্শে থাকিবার পরে, ক্রমে-ক্রমে উত্তেজনা ঘটিয়া ইহাদের পাতা বুজিয়া যায়।

ইহা ছাড়াও পাতার আরও বহু বিকৃতি বা পরিবর্ত্তন আলোক সংস্পর্শে ঘটে, তাহার বিবরণ ও জগদীশচন্দ্র-প্রদত্ত তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পরে প্রদত্ত হইতেছে।



ছয়

সাধারণতঃ কতকগুলি গাছের পাতাকে দেখা যায় সন্ধ্যাবেলায় নিমীলিত ও প্রভাতে উন্মীলিত হইতে। দৈনিক একবার ইহারা এইরূপ নিমীলিত হয়ই ; নির্দিষ্ট সময়ে। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন এই নির্দিষ্ট নিয়মিত নিমীলনকে আটকাইতে পারে না। এই ব্যাপার প্রাচীন উদ্ভিদবিদগণের দ্বারা উদ্ভিদনিদ্রা নামে অভিহিত হইত।

আধুনিক পণ্ডিতেরা বলেন—আলোক-সংস্পর্শে উদ্ভিদের পাতার পরিবর্ত্তন ঘটে বটে, কিন্তু এ নিমীলন ব্যাপারটা সে জাতীয় পরিবর্ত্তন নয়। কোন্ দিক হইতে আলোক আসিতেছে—তাহার সহিত এ নিমীলনের কোন সম্পর্ক নাই, অথচ পাতার অন্য সমস্ত নড়াচড়ার সহিত আলোকপাতের দিকের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। পাতা আজ যে-দিকে মুখ করিয়া যেভাবে ঘুমাইল, চিরদিনই সেইরূপ ভাবে ঘুমাইবে।

জগদীশচন্দ্রের মত এই যে, পত্রমূল বা Pulvinus-এর উপর-পিঠের উত্তেজনা ও নীচের-পিঠের উত্তেজনায় যখন তারতম্য থাকে, তখন পাতা ও ডালে নড়াচড়া দেখিতে পাওয়া যায়। যে পিঠে উত্তেজনা বেশী, সে দিকটা সহজেই অন্য পিঠ হইতে বেশী সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, কাজেই ডাল বা পাতা তখন বাঁকিয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়াই জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ-নিদ্রার কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি উদ্ভিদের নিদ্রাকে তাহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত গতিশীলতারই প্রকারভেদ বলিয়া নির্দেশ



আচার্য জগদীশচন্দ্র

করিয়াছেন। ধারাবাহিক সাড়ার নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে উদ্ভিদের দেহে সাড়ার লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। এই ব্যবধান ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হইতে পারে। বৃহৎ ব্যবধান কখনো কখনো চব্বিশঘণ্টা ব্যাপীও হওয়া সম্ভব। তাহা ছাড়া পত্রমূলের উপরের-দিক অপেক্ষা নীচের-দিক অধিক উত্তেজনাপ্রবণ। উপরের দিকে সূর্য্যালোক পড়ে এবং তাহার তাপ ক্রমে ক্রমে নীচের দিকে পৌছায়। উপর-পিঠ হইতে নীচের-পিঠ বেশী উত্তেজিত হইয়া সেই উত্তেজনার বশে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এই সঙ্কোচনের ফলে পাতা মুখ গুঁজিয়া নীচের দিকে বাঁকিয়া যায়। বেলা যত বাড়ে, সূর্য্যালোক তত বেশী প্রখর হয়; পত্রমূলের উপরে প্রত্যক্ষ আলোকের উত্তেজনা ও নীচের দিকে পরোক্ষ পরিবাহিত উত্তেজনাও তত বাড়িতে থাকে। ইহার ফলে পত্রমূলের নিম্নভাগ সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সঙ্কোচন-প্রক্রিয়া ক্রমেই পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে ও সন্ধ্যাবেলায় সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তখনই পাতাগুলির নিমীলন দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, সন্ধ্যাগমে হঠাৎ পাতাগুলি বুজিয়া যায়। জগদীশচন্দ্র বলেন—তাহা নহে। আলোকপাত আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পত্রমূলে সঙ্কোচনের কারণ উদ্ভূত হইয়াছিল। এই কারণ ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে বেলা-শেষে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে যখন নিমীলন-প্রক্রিয়া সাঙ্গ হয়, তখনই অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায় তাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও মিথ্যা


আচার্য জগদীশচন্দ্র

ধারণার সৃষ্টি করে যে, সন্ধ্যাগমই ঐ নিমীলনের হেতু।

সাধারণের বিশ্বাস—সন্ধ্যাগমে পাতা-সকল ঘুমাইয়া পড়ে ও সকালবেলা সেগুলি জাগিয়া উঠে। বাস্তবিকই সন্ধ্যাবেলা যে-সমস্ত পাতাকে বুজিয়া যাইতে দেখা গিয়াছিল, রাত্রিশেষে তাহাদিগকে আবার খোলা অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের ব্যাখ্যা এইরূপ :—সমস্ত দিন গাছের উপর আলোক পড়িয়াছে, উত্তেজনার অবিরাম প্রবাহ গাছের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে—তাহারই ফলে একটু একটু করিয়া তিলে তিলে গাছের পাতা নামিতে নামিতে বুজিতে-বুজিতে অবশেষে সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল যে, নিমীলন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণতায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। ইহা উত্তেজনারই কাজ। কিন্তু কথা এই যে, সারাদিন ধরিয়া যে উত্তেজনা গাছের দেহে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা পাতা কয়টীকে বুজাইয়া দিয়াই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। তাহার কিয়দংশ গাছের দেহেই সঞ্চিত রহিয়া গিয়াছে। এখন সেই উত্তেজনা কিরূপভাবে কাজ করিবে? ইহা এখন নিমীলিত পাতাগুলিকে আবার উন্মীলিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিবে। অর্থাৎ পাতাগুলি আবার খাড়া হইয়া উঠিবে ও খুলিয়া যাইবে। আর যদি উত্তেজনার সঞ্চয় বৃক্ষদেহে না থাকিয়া থাকে, সমস্ত উত্তেজনা পাতাগুলিকে বুজাইয়া দিতেই ব্যয় হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে রাত্রিবেলার আলোকাভাবজনিত অনুত্তেজনা পাতার আণবিক-বিকৃতি শীঘ্র শীঘ্র দূর করিয়া দিতে থাকিবে।



দূর হইতে হইতে অবশেষে রাত্রিশেষে পাতার দেহে আর বিকৃতি থাকিবে না এবং নিমীলিত পাতা প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার স্বাভাবিক খোলা অবস্থায় উপনীত হইবে। এইরূপেই সন্ধ্যাবেলায় পাতার ঘুমাইয়া পড়া ও সকালবেলায় পাতার ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠার প্রবাদ রটিয়া গিয়াছে।

মেঘাচ্ছন্ন দিনে পাতার উপর আলোক বেশী পড়ে না, কাজেই উত্তেজনা সৃষ্টি হয় কম। অথচ পাতা নামিয়া বুজিয়া যায় কেন? ইহার ব্যাখ্যা দিতে আচার্য্য বলিয়াছেন—এটা অভ্যাস ব্যতীত আর কিছু নহে। কথাটা প্রথমে হাস্যকর বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে জিনিযটা খুবই স্বাভাবিক। প্রতিদিন সন্ধ্যা-বেলায় বুজিয়া যাইতে যাইতে গাছের অণুগুলি এরূপ একটা বিপর্য্যয়ের ভিতর পৌঁছায় যে, পরে—দৈনিক উত্তেজনার অভাব যদি কোনদিন ঘটে, তাহা হইলেও অণুগুলি অভ্যস্ত বিকৃতি এড়াইয়া থাকিতে পারে না। সারাদিন আলোর সংস্পর্শে আসিয়া না থাকিলেও ঠিক প্রতিদিনকার মতই অন্ধকারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়ে।

এক্ষণে উদ্ভিদের দৈহিক শক্তির মূলাধার কোথায়—তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। প্রাণীরা নানাপ্রকার খাদ্যের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকে। কোন প্রাণী উদ্ভিদ লতাপাতা ফলমূল খায়, কেহ-বা মাংসাদি ভোজন করে। এই ভোজনের অভাবে তাহার সঞ্চিত শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, নূতন শক্তি আহৃত হয় না—



ফলে প্রাণী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে অবসাদগ্রস্ত ও পরিণামে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ত গেল প্রাণীর কথা, কিন্তু উদ্ভিদের বেলায় কি? আচার্য্য বসু প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড় সকলের ভিতরই একই জীবন-ধর্মের অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। জীবনের প্রধান লক্ষণ ও অবলম্বন হইতেছে খাদ্য। এই খাদ্য উদ্ভিদ পায় কোথায়—তাহাই দেখা যাউক।

উদ্ভিদের পাতা সবুজ রং। এই রংটা শুধু দেখিতে সুন্দর বলিয়া যে উদ্ভিদের দেহে আরোপ করিয়াছেন ভগবান, তাহা নহে। এই রংয়ের একটা বিশেষ গুণ আছে। ইহা সূর্য্য হইতে তাপ ও আলো টানিয়া লইতে দক্ষ। এই রং পাতার ভিতর থাকাতে উদ্ভিদ সূর্য্যালোক হইতে তাপ ও আলো সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। বাতাস হইতেও একটি বাষ্প সংগ্রহ করে, তাহা Carbonic acid বা অঙ্গারক বাষ্প। উদ্ভিদের দেহের ভিতরে এই বাষ্প সূর্য্য হইতে আকৃষ্ট তাপ ও আলোকের সহিত মিশিয়া যায়। এই মিশ্রণে যে বস্তুটির জন্ম হয়—তাহাই উদ্ভিদের জীবনধারণের উপায়। তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে এই বস্তু ভিন্ন দ্বিতীয় অবলম্বন উদ্ভিদের নাই।

অঙ্গারক বাষ্প বাতাসে যে অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাহা উদ্ভিদ-দেহের পক্ষে সহজপাচ্য নহে। উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করিয়া তথায় সঞ্চিত তাপ ও আলোকের সহিত মিশ্রিত হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হইলে, তবেই সেই অঙ্গারক উদ্ভিদের সুখাদ্য হইয়া



দাঁড়ায়। কতটা অঙ্গারক বাষ্প কোন্ বিশেষ উদ্ভিদের দেহে প্রবিষ্ট হইল এবং তাহা হইতে ঠিক কতটা পরিমাণ খাদ্য উদ্ভিদের লাভ হইল, তাহা পরিমাপের জন্য আচার্য্য জগদীশচন্দ্রই একটি নূতন ও অভিনব যন্ত্র স্বয়ং আবিষ্কার করিয়াছেন ; ইহার নাম Automatic Recorder tor Photo Synthesis. এই যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাক সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র যেসব নূতন তথ্য আবিষ্কার ও প্রমাণ করিয়া জগৎবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়কর। এই অঙ্গারক বাষ্প শুধু স্থলজ উদ্ভিদই গ্রহণ করে, তাহা নহে। ইহা জলজ উদ্ভিদেরও খাদ্য জোগায়। জলের সহিত অঙ্গারক বাষ্প মিশানো থাকে—উদ্ভিদ তাহা শোষণ করিয়া লইয়া তাহা হইতে অক্সিজেনটা বাহির করিয়া দেয়—ঐ অক্সিজেন বুদ্বুদের আকারে বা শৈবালের দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, উদ্ভিদ রাত্রিকালে মোটেই ভোজন করে না। প্রভাত হইবারও কিছুক্ষণ পরে অর্থাৎ বেলা প্রায় আটটায় তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হয়। এই ক্ষুধা সারাদিনই জাগরূক থাকে। মানুষ একবার খাইলে তাহার পর আর কয়েক ঘণ্টা আহারে তাহার রুচি থাকে না। কিন্তু উদ্ভিদের বেলা সেকথা খাটে না। সে খাইতেছেই—খাইতেছেই। খাওয়া বন্ধ করিবে দিনের অবসানে। অনবরত খাওয়ার ভিতর আবার দুপুর বেলায় খাওয়ার মাত্রা ও পরিমাণ অত্যধিক বাড়িয়া যায়।



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

অর্থাৎ আলোকের প্রাবল্য যত বেশী হইবে, সে তাপ ও আলোক সংগ্রহ করিবে তত বেশী। আবার বেলা কম পড়িতে আরম্ভ করিলে, মন্দীভূত সূর্য্যালোকের সঙ্গে তাহারও ক্ষুধামান্দ্য উপস্থিত হয় এবং অবশেষে আলো নিবিয়া গেলে তাহার খাওয়ারও শেষ হয়।

উত্তেজনায় হজমের কাজের বিঘ্ন হয়। প্রাণীরও, উদ্ভিদেরও। হজমি ঔষধ খাইলে মানুষের ক্ষুধা ও ভোজন শক্তি বাড়িয়া যায়, উদ্ভিদেরও তাহাই হয়। Iodine বা Extract of Thyroid Gland-এর কণিকা-মাত্র জলের সহিত মিশাইয়া উদ্ভিদের অঙ্গে তাহা প্রয়োগ করিলে তাহার ভোজন ও হজমের ক্ষমতা যে অসম্ভব রকমে বাড়িয়া যায়, তাহা জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করিয়াছেন।

আহারের জন্য সূর্য্যের নিকট হইতে যে পরিমাণ তাপ ও আলোক উদ্ভিদেরা গ্রহণ করে, তাহার সমস্তটাই কি তাহার দেহ পোষণে ব্যয়িত হয়? না, তাহা হয় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিজ্ঞানবিদেরা বলিতেন, শতকরা এক ভাগ মাত্র তাপ উদ্ভিদের কাজে লাগে, অন্য সব অপব্যয় হয়। জগদীশচন্দ্র অপেক্ষাকৃত উন্নততর যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শতকরা সাড়ে-সাত ভাগ তাপ উদ্ভিদের কাজে আসে। এই যন্ত্রের নাম Magnetic Radiometer.

শতকরা সাড়ে-সাত ভাগ মাত্র প্রকৃত সদ্ব্যবহারে লাগে—অবশিষ্ট সমস্তটা শক্তি হয় বিনষ্ট। মনুষ্যচালিত এঞ্জিনেও



কয়লা পুড়িয়া যে তাপ বা শক্তি প্রস্তুত হয়, তাহার মাত্র শতকরা পনর ভাগ এঞ্জিন চালাইবার জন্য আমরা কাজে লাগাইতে পারি, বাকি অংশটা নষ্ট হইয়া যায়। এ অবস্থায় বলিতে পারা যায়, উদ্ভিদের এঞ্জিন আমাদের এঞ্জিনের মত সুগঠিত নয়। কিন্তু উদ্ভিদের দেহে সূর্য্যতাপ স্থির শক্তি (Potential Energy) রূপে সঞ্চিত হইয়া থাকে। কাঠ বা কয়লা পোড়াইলে সেই সঞ্চিত শক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। মনুষ্য-দেহেও এইভাবে হয়ত কোনদিন তাপ সঞ্চয়ের উপায় আবিষ্কার করা যাইবে।

সাত

উদ্ভিদ ঠিক কি প্রকারে রস শোষণ করে, তাহা বৈজ্ঞানিক জগতে এক দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মত হইয়া ছিল। এতদিন এই বিশ্বাসই বলবৎ ছিল যে, এই প্রক্রিয়ার ভিতর উদ্ভিদের যে ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়—তাহা জড়েরই ধর্ম, প্রাণীধর্ম নয়। অর্থাৎ রস শোষণ ব্যাপারে উদ্ভিদের স্বকীয় কর্তৃত্ব বিন্দুমাত্রও নাই—যাহা আছে তাহা যন্ত্র মাত্রেরই বিশেষত্ব। যন্ত্র চালাইয়া দিলে যেমন সে নির্বিবাদে ও নির্বিকারে নিজ কার্য্য করিয়া চলে, উদ্ভিদের মূলও তেমনি অচেতন ও আত্মকর্তৃত্বহীন হইয়া রস সংগ্রহ করিয়া যায়।



আচার্য জগদীশচন্দ্র

এই মত যে ভ্রান্ত, তাহা জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষাবলীর সাহায্যে প্রমাণ হইয়াছে। তিনি যে মত প্রচার করিয়াছেন—তদনুসারে রস শোষণের ভিতর উদ্ভিদের প্রাণীবৎ আত্মসচেতনতা ও আত্মকর্তৃত্ব পরিপূর্ণ ভাবেই বিদ্যমান। এই দিক দিয়া প্রাণীদেহের সহিত তাহার সামঞ্জস্য খুবই ঘনিষ্ঠ। বায়ু চলাচলের জন্য যেমন প্রাণীর হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয়, ধমনী ওঠা নামা করে, বৃক্ষদেহেও সেইরূপ একটি প্রক্রিয়া কাজ করে—যদিও সে প্রক্রিয়া চর্মচক্ষের দৃষ্টিগোচর নয়। উদ্ভিদের দেহে এমন একটি অংশ আছে—যাহা স্থূলতঃ প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের মতই কাজ করে। ইহা তালে-তালে কাঁপিতে থাকে ও সেই অতি মৃদু অলক্ষ্য-কম্পনের সহিত মিল রাখিয়া ভূমি হইতে সংগৃহীত রসধারা উদ্ভিদের দেহের সমস্ত অংশে ছড়াইয়া পড়ে। কোন কারণে উদ্ভিদের দেহ উত্তেজিত হইলে এই কম্পনের বেগ বাড়িয়া যায় ও রস-প্রবাহের বেগ বর্দ্ধিত হয়। পক্ষান্তরে উদ্ভিদের দেহ অবসাদগ্রস্ত হইলে সঙ্গে-সঙ্গে এই রস-প্রবাহ স্তিমিত বা একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, উদ্ভিদ-শরীরে এমন কোন যন্ত্র আছে—যাহা প্রাণীর হৃৎপিণ্ড ও ধমনীর স্থলাভিষিক্ত।

এমন অতি নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী যথেষ্ট আছে—যাহাদের দেহে উন্নত প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের মত কোন সুগঠিত যন্ত্র বা প্রত্যঙ্গ বর্ত্তমান নাই। তবে তাহাদের রক্তচলাচল হয় কি করিয়া?



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

ঠিক হৃৎপিণ্ড বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা তাহাদের শরীরে না থাকিলেও এমন একটা অংশ আছে, যাহা হৃৎপিণ্ডেরই মত তালে-তালে স্পন্দিত হয় ও সেই স্পন্দনের তালে-তালে রক্ত-সঞ্চালন সমগ্র শরীরে চলিতে থাকে। এই যন্ত্র হৃৎপিণ্ডের মত একটা সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ নয়। ইহা সুদীর্ঘ, বহুস্থানব্যাপী একটা প্রত্যঙ্গ।

এখন উদ্ভিদের দেহেরও একটা অংশ যদি এই নীচজাতীয় প্রাণীদের দেহের উক্ত স্পন্দনশীল দীর্ঘ অংশের মত স্পন্দন ধর্মযুক্ত হয় এবং সেই স্পন্দনই যদি উদ্ভিদদেহে রস-প্রবাহ সঞ্চারের জন্য দায়ী হয়,—তবে তাহা বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া কে না স্বীকার করিবে? এই বিস্ময়কর ব্যাপারই যে প্রকৃত সত্য, তাহা আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারে প্রমাণিত হইয়াছে। শুধু যে প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদের দেহের অংশবিশেষ, হৃৎপিণ্ডের মত ধর্ম ও ক্রিয়াবিশিষ্ট, তাহাই আবিষ্কার করিয়া তিনি নিরস্ত হইতে পারেন নাই। তিনি আরও দেখাইয়াছেন—রক্ত চলাচল ও রস চলাচলের ব্যাপারে অনেক-কিছু খুঁটিনাটি প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে এমন সাদৃশ্যবান যে, তাহাকে আকস্মিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার কোন উপায় নাই। উদ্ভিদের দেহে হৃৎপিণ্ড-স্থানীয় অংশটি বাহির করিবার জন্য তিনি নিজে এক অতি পরমাশ্চর্য্য অথচ অতি সরল যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার নাম Spytmograph, ইহার ভিতর দুইটি শলাকা আছে।



আচার্য জগদীশচন্দ্র

উদ্ভিদদেহের স্পন্দনবান অংশটি দেহের অতি নিভৃত অংশে লুক্কায়িত থাকে, এবং তাহার স্পন্দন চর্মচক্ষে ধরা পড়ে না—তাহা পূর্ব উক্ত হইয়াছে। তাই তাহাকে চর্মচক্ষে দৃষ্টিগোচর করিবার উদ্দেশ্যেই জগদীশচন্দ্র এই যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। বলা হইয়াছে যে, ইহার ভিতর আছে যুগ্মশলাকা। যন্ত্রটির গঠন এইরূপ যে, একটি শলাকা উদ্ভিদদেহে দৃঢ়ভাবে বসাইয়া দিলে, অন্য শলাকাটি ওঠা-নামা করিতে পারে। এখন সংলগ্ন অংশটি উদ্ভিদদেহমধ্যস্থ সুগোপন হৃৎপিণ্ডটির সহিত বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে ও তাহারই ফলে শিথিল শলাকাটি হৃৎস্পন্দনের সমতালে স্পন্দিত হইতে অর্থাৎ ওঠা-নামা করিতে থাকে। এই স্পন্দন এত অসম্ভব-রকম মৃদু যে, তাহা চোখে দেখিতে পাইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তাহাকে বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়া তবে দৃষ্টির গোচরে আনয়ন করা সম্ভব হইয়াছে। রক্ত চলাচলের সময় প্রাণীর হৃৎপিণ্ড ওঠে ও নামে, রস-প্রবাহের সঙ্গে-সঙ্গে বৃক্ষদেহের হৃৎপিণ্ডও তেমনি করে। এই ওঠা-নামার সঙ্গে-সঙ্গে শিথিল শলাকাটি নড়িতে থাকে ও উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন ধরাইয়া দেয়, যদিও—আমাদের চোখে পড়ে স্পন্দনের যে-গতি, প্রকৃত গতি তাহার পঞ্চাশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

ইহা ছাড়া, এই ব্যাপারেরই সহিত সংশ্লিষ্ট আরও একটি অতি গুরুতর তথ্য জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাণী-দেহের উত্তেজনা ও অবসাদে হৃৎস্পন্দন বাড়ে ও কমে,



উদ্ভিদদেহেও তাহাই হয়। উত্তেজক পদার্থ উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করিলে হৃৎস্পন্দনের গতি বাড়িয়া যায় এবং উপর দিকেই সেই স্পন্দনের ঝাঁকুনি নীচের দিক হইতে বেশী প্রবল হয়। তেমনি যাহাতে অবসাদ আসিতে পারে, এমন দ্রব্যের প্রয়োগ উদ্ভিদহৃদয়ের স্পন্দন কমাইয়া দেয় ও নীচের দিকে ঝাঁকুনি বেশী আসে। কাজেই নীচের দিকে ঝাঁকুনির প্রকোপ দেখিতে পাইলে স্বচ্ছন্দে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, উদ্ভিদদেহে অবসাদ আসিয়াছে। এইরূপেই ঝাঁকুনি উপর দিকে প্রবল হইলে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, কোন দ্রব্যগুণে উদ্ভিদদেহে উত্তেজনার বৃদ্ধি হইয়াছে।

অতি উত্তেজক ও অতি অবসাদক বস্তু প্রয়োগে উদ্ভিদের দেহে ও প্রাণীর দেহে একই প্রকার ফল দৃষ্টিগোচর হয়, ইহা প্রমাণ করিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্র জগৎকে বিস্মিত করিয়াছেন। কর্পূর উত্তেজক। প্রাণীর দেহে দুই হাজার ভাগ জলে দুইভাগ কর্পূর মিশাইয়া প্রয়োগ করায় তাহার হৃৎস্পন্দন কিভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল—তাহা যন্ত্রসাহায্যে ধরিয়া সেই বৃদ্ধির অনুলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছিল। পরে সেই মিশ্রিত কর্পূরজলই আবার উদ্ভিদের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া দেখা গেল যে, সেখানেও ঠিক একই পরিমাণে হৃৎস্পন্দনের বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পক্ষান্তরে অতি অবসাদক মরফিনের প্রয়োগে প্রাণীর ও উদ্ভিদের দেহে যে অবসাদ আসিয়াছিল তাহা হৃৎস্পন্দনের হ্রাসরূপে দেখা দিয়াছিল উভয় ক্ষেত্রেই। এবং সেই হ্রাস যে,



উভয়ত্রই প্রায় একই রূপ, তাহাও অনুলিপি হইতে প্রমাণিত হইয়াছিল। অবসাদক পটাস ব্রোমাইড ও উত্তেজক মৃগনাভি পর-পর প্রয়োগ করিয়া উদ্ভিদদেহে ও প্রাণীদেহে অবসাদ ও উত্তেজনার যে লক্ষণ দেখা দিয়াছিল, তাহাও দুই ক্ষেত্রেই একইরূপ।

ষ্ট্রিকনাইন ঔষধটী অল্পমাত্রায় প্রয়োগে প্রাণীদেহে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, কিন্তু অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে তাহাতেই আবার জীবনীশক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইতে পারে। এই প্রক্রিয়া উদ্ভিদদেহেও অনুরূপ ফলই উৎপাদন করে। হাজার ভাগ জলে এক ভাগ ষ্ট্রিকনাইন মিশাইয়া গাছের শরীরে উহা প্রয়োগ করিলে স্পন্দন বাড়িয়া উত্তেজনার বৃদ্ধি হয়, আবার উহার চেয়ে অধিক শক্তিমান মাত্রায় ষ্ট্রিকনাইন প্রয়োগ করিলে দারুণ অবসাদ আসিয়া পড়িবে ও উদ্ভিদ অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে! গোখুরা সাপের বিষ, মাছের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া যেভাবে মৃত্যু ঘটাইতে পারে, উদ্ভিদের দেহেও সেইভাবেই মৃত্যু আনয়ন করে। কিন্তু এই গোখুরা সাপের বিষ অতি অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করিলে তাহা উত্তেজক ঔষধের কাজ করে, তাহা উদ্ভিদদেহে প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ করা গিয়াছে। প্রাণীদেহে ত' উহা উত্তেজনা আনয়নের জন্য কবিরাজী-সূচিকাভরণ ঔষধের মধ্য দিয়া চিরকালই প্রযুক্ত হইতেছে। এমন কি, জল হইতে উত্তোলিত মৃতপ্রায় মৎস্যও সূচিকাভরণ প্রয়োগে বাঁচিয়া উঠিয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত আছে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র



উদ্ভিদের দেহে যে ঠিক প্রাণীদেহেরই মত স্নায়ুর অস্তিত্ব আছে, ইহা পূর্ব-বৈজ্ঞানিকগণের জ্ঞাত ছিল না। প্রাণীর স্নায়ুর মত উদ্ভিদেরও স্নায়ু উত্তেজনার প্রধান পরিবাহক, অর্থাৎ বাহির হইতে উত্তেজনা বহন করিয়া তাহা দেহমধ্যস্থ স্নায়ুকেন্দ্রে লইয়া যায় এবং সেখান হইতে প্রতিকূল উত্তেজনা লইয়া আবার বাহিরের দিকে ছুটিয়া আসে। ধরা যাউক – বাহিরে কোন বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, যেমন তাপের আধিক্য। এই আধিক্যের বার্ত্তা বহন করিয়া উত্তেজনা পৌঁছিবে উদ্ভিদের স্নায়ু কেন্দ্রে, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবে বাহির দিকে এই বার্ত্তা লইয়া যে, "নিজের পাতা ও ডাল গুটাইয়া আত্মরক্ষা কর।" অমনি পাতা বুজিয়া আসিবে। ব্যাপারটা ঠিক প্রাণীদেহের স্নায়ুর ক্রিয়ার মতই। বাহিরে দেহে আঘাত লাগিলে সেই আঘাতের বার্ত্তা প্রাণীর স্নায়ুর ভিতর দিয়া স্নায়ুকেন্দ্রে গিয়া পৌঁছাইবে। পরে সেখান হইতে ঐ স্নায়ু আবার বাহিরে গিয়া খবর দিলে, প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত হইয়া বা বাঁকিয়া চুরিয়া আত্মরক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হইবে। জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের দেহে এই স্নায়ুজালের ক্রিয়া ও গতিবিধি সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই যন্ত্রে আরও ধরা পড়িয়াছে যে, যে-গতি লইয়া অন্তর্মুখী স্নায়ু স্নায়ুকেন্দ্রে বার্ত্তা পৌঁছিয়া দেয়, তাহার চেয়ে অনেক ক্ষিপ্রগতিতে বহির্মুখী বার্ত্তা লইয়া আসে। গতির এই আধিক্য কোথা হইতে আসে—এ প্রশ্ন স্বতঃই উঠিবে।



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

জগদীশচন্দ্র যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা এই :—অন্তর্মুখী উত্তেজনার গতি মৃদু হইলে ক্ষতি হয় না। কিন্তু বহির্মুখ উত্তেজনার গতি ক্ষিপ্র হওয়া আবশ্যক। কারণ অন্তর্মুখ স্নায়ু শুধু বিপদের খবরই জোগায়, বহির্মুখ স্নায়ু বহিয়া আনে আত্মরক্ষার নির্দেশ। কিন্তু কথা এই যে, আত্মরক্ষার নির্দেশ লইয়া যে বর্দ্ধিত গতিতে বহির্মুখ স্নায়ু বাহির পানে আসিতেছে, সে বর্দ্ধিত গতি সে পায় কোথায়? এই অতিরিক্ত শক্তি তাহাকে যোগায় কে? জগদীশচন্দ্র ইহারও অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তিনি বলেন—এই শক্তি জোগাইবার জন্য উদ্ভিদ নিজদেহে শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখে। বিপদের সময়ে নিজের দেহের শক্তিভাণ্ডার হইতে শক্তি জোগাইয়া সে স্নায়ুর গতিকে শক্তিমান করিয়া তোলে—যাহাতে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিবার প্রবৃত্তি সে অচিরেই সঙ্কটে-পতিত বৃক্ষ-প্রত্যঙ্গের নিকট বহন করিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হয়। উদ্ভিদের স্নায়ুর এই ধর্ম পূর্ব-বৈজ্ঞানিকগণের জ্ঞাত ছিল না, ইহা জগদীশচন্দ্রেরই আবিষ্কার।

স্বাস্থ্য এবং শীত গ্রীষ্মের অবস্থার উপর প্রাণীর স্নায়ুজালের উত্তেজনা-বহন-সামর্থ্যের অতি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। উদ্ভিদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। অত্যধিক শীতে প্রাণীর স্নায়ু জড়সড় হইয়া পড়ে, বাহির হইতে ভিতরে ও ভিতর হইতে বাহিরে উত্তেজনা বহন করিয়া দৌড়াদৌড়ি করিবার ক্ষমতা



তাহার হইয়া পড়ে অবসন্ন। ইহা উদ্ভিদের বেলায়ও জগদীশচন্দ্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গ্রীষ্মকালে উদ্ভিদদেহের স্নায়ু অধিকতর কর্মঠ থাকে। প্রাণীর বেলায় দেখা যায় যে, স্থূলদেহ প্রাণী অপেক্ষা ক্ষীণদেহ প্রাণীর স্নায়ু অধিকতর উত্তেজনাবহনক্ষম। এই ব্যাপারও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সমান ভাবেই সত্য। উদ্ভিদের ডাল যত সরু হইবে, তাহার ভিতর দিয়া উত্তেজনাও চলাচল করিবে তত তাড়াতাড়ি। লজ্জাবতী অতি সরু লতা। তাহার বোঁটায় উত্তেজনা চলাচল করে মিনিটে প্রায় হাজার ইঞ্চি। প্রাণীর ভিতর উন্নততর শ্রেণীগুলির স্নায়বিক উত্তেজনার গতি ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী বটে, কিন্তু এমন অনেক নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী বর্ত্তমান, যাহাদের এই গতি মিনিটে হাজার ইঞ্চি অপেক্ষা অনেক কম। কাজেই বলা যাইতে পারে, উদ্ভিদের স্নায়ুর গতি উন্নত ও অনুন্নত প্রাণীর স্নায়ুগতির মাঝামাঝি স্থান অধিকার করিয়াছে।

প্রাণীর স্নায়ু যে দেহের ঠিক কোন অংশে অবস্থিত, তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করা খুবই সহজ। উদ্ভিদদেহের স্নায়ু কিন্তু অত সহজে দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া অতি সূক্ষ্ম শক্তিবিশিষ্ট যন্ত্রাবলীর সাহায্যে তবে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদদেহে স্নায়ুর অস্তিত্ব ও তাহার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পূর্বে বিজ্ঞানবিদেরা এক বাক্যে ঘোষণা করিতেন যে, উদ্ভিদেরা স্নায়ুবিরহিত বস্তু, এ বিষয়ে প্রাণীদের সহিত তাহাদের কোনই সাদৃশ্য নাই।



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

জগদীশচন্দ্রের এই সকল আবিষ্কারের পরে তাঁহারা নিজের নিজের ভুল উপলব্ধি করিয়াছেন।

উদ্ভিদের স্নায়ু অতি গভীর ভাবে তাহার দেহের ভিতর নিহিত। তাহাকে চারি দিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে উদ্ভিদের দেহের কাষ্ঠাংশ, যাহা বিদ্যুৎ-পরিচালক নয়। সমুদ্রগর্ভে টেলিগ্রাফের তার বসানো আছে, তাহার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলাচল করে। ঐ বিদ্যুৎ যাহাতে বাহির হইয়া আসিতে না পারে, তাহার জন্য ঐ সব তার গাটাপার্চার আবরণে মুড়িয়া দেওয়া হয়। উদ্ভিদের স্নায়ু ঠিক ঐ টেলিগ্রাফের তারের মত, আর ঐ তারের ভিতরকার বিদ্যুৎ-প্রবাহ যাহাতে বাহিরে ধরা না পড়ে, তাহারই জন্য ঐ স্নায়ুর চারিপাশে কাঠ দিয়া মুড়িয়া রাখা হইয়াছে! কাঠ ঠিক গাটাপার্চা বা রেশমের মতই অপরিচালক। এখন এই কাঠের আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরকার স্নায়ুর সন্ধান করিবার জন্য জগদীশচন্দ্র একরূপ শলাকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার সহিত বিদ্যুৎ-সন্ধানী Galvanometer যন্ত্র সংলগ্ন থাকে। ঐ শলাকা দ্বারা কাঠের আবরণ ভেদ করিলে ক্রমে তাহা ভিতরকার স্নায়ুর সংস্পর্শে আসে ও স্নায়ুর অস্তিত্ব ও অবস্থানের গভীরতা নির্ণয় করিয়া দেয়।

বাহির হইতে যে উত্তেজনা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে দুই প্রকারে। তীব্র উত্তেজনার ফলে তীব্র অনুভূতিই জাগিবার কথা। কিন্তু আমাদের স্নায়ু অনেক ক্ষেত্রে



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

তীব্র উত্তেজনাকে মৃদু ও মৃদু উত্তেজনাকে তীব্ররূপে আমাদের অনুভূতির ভিতর আনয়ন করে। বাহিরে যে সকল প্রাকৃতিক শক্তির কার্য্য অহরহঃ চলিতেছে, তাহাদের উপর মানুষের হাত নাই বলিলেই চলে। কিন্তু সেই সকল প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়ায় আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীতে যে উত্তেজনার সংঘর্ষ ঘটিল, তাহার পরিবর্ত্তন করা আমাদের শক্তির বহির্ভূত নয়। বহির্জগতের উত্তেজনা যখন আমাদের স্নায়ুর ভিতর দিয়া পরিচালিত হইতে থাকে, তখন তাহার তীব্রতার পরিবর্ত্তন ঘটানো অসম্ভব বলিয়া ধারণা করিবার কারণ নাই। স্নায়ুর ভিতর দিয়া উত্তেজনার চলাচল আর টেলিগ্রাফের তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলাচল—এ দুইটি বস্তু অনেকটা সাদৃশ্যযুক্ত হইলেও ইহারা সম্পূর্ণ এক নহে। ইহাদের মধ্যে প্রবল পার্থক্য এই রহিয়াছে যে, ধাতুর তার ভিতরের চলমান বিদ্যুৎ প্রবাহের বেগ বা তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে না—কিন্তু প্রাণীদেহের স্নায়ু অতটা অক্ষম নয়। তাহারা স্থল-বিশেষে মৃদু উত্তেজনাকে তীব্র ও তীব্রকে মৃদু করিতে পারে। অবশ্য কি প্রকারে পারে সে রহস্য এখনো আমাদের জ্ঞাত নহে। যেদিন তাহার সমাধান হইবে, সেদিন অনেক অবিশ্বাস্য কাহিনীকে আমরা সত্য বলিয়া মানিতে বাধ্য হইব। বহু প্রাকৃতিক ব্যাপার আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে—স্নায়ু-ক্রিয়ার বর্ত্তমান অর্দ্ধ-পরিজ্ঞাত অবস্থায়, এইগুলি যখন সুষ্ঠুভাবে জানিবার উপায় হইবে, তখন মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডার বহুল পরিমাণেই বাড়িয়া যাইবে।



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

আচার্য্যদেবের অগণ্য নব আবিষ্কারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও ব্যাখ্যা প্রদান এই গ্রন্থের ক্ষুদ্র কলেবরের পক্ষে অসম্ভব। মোটামুটি সর্বাধিক সুপরিচিত কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াই আমাদিগকে তৃপ্ত থাকিতে হইবে। বঙ্গের সুসন্তান, ভারতের গৌরব, বিশ্ববরেণ্য মহাবৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের মহিমাময় বিজ্ঞানসাধনার যোগ্য ভাষ্যরচনার দিকে যোগ্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক—ইহাই আকিঞ্চন।

শেষ